সূচী

বাংলার নবযুগ ও
বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা

বাংলার নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা

বাংলার নবযুগ । পটভূমিকা

আধুনিক বাংলার সাংস্কৃতিক বিবর্তনে চিন্তানায়ক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর গুরুত্ব অসাধারণ। তাঁর মতামত আজকের পরিপ্রেক্ষিতে কতটা গ্রহণীয়, এমনকি রুচিকর, সেই অবশ্যম্ভাবী প্রশ্নের উত্তর যা-ই হোক—তাঁর ঐতিহাসিক গুরুত্বকে নিছক ঘটনার বিচারেও কোনক্রমে-ই অস্বীকার করা যায় না। বাংলাদেশের প্রথম রাজনৈতিক গণ-আন্দোলনের ভাবভিত্তি প্রধানত তাঁর রচনা—তাঁর অনুশীলন ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাবে একসময়ে এদেশে বিভিন্ন যুব-প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছিল, অনুশীলন সমিতি নামকরণে-ই তা সুস্পষ্ট।

বাংলার হিন্দু সমাজে, সামাজিক নীতি ও বোধ-বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও তাঁর প্রভাব অত্যন্ত গভীর হয়েছিল। কিন্তু গণতান্ত্রিক বিচারে সম্ভবত ব্যাপক হয়নি। তিনি পশ্চিম-ইয়োরোপের তৎকালীন বিভিন্ন যুক্তিবাদী দার্শনিক মতামতগুলির সংগে হিন্দুসমাজের বোধ-বিশ্বাসের সুসঙ্গতি বিধান করে হিন্দু ধারণাগুলির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন এবং সেই কালের হিন্দু শিক্ষিত সমাজের মানসিক প্রতিক্রিয়া বা বিশ্বাস অনুযায়ী, তাতে সফল হন।

উনিশ শতকের পাশ্চাত্য দৃষ্টি-ভঙ্গীর বিচারে বাংলার হিন্দু সমাজের ইংরেজি শিক্ষিত শ্রেণী যে হীনমন্যতার দ্বারা আক্রান্ত হন, সেই হীনমন্যতার প্রভাব অতিক্রম করতে যাঁদের রচনা ও মত বিশেষত কার্য্যকরী হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সমাজের কথা বাদ দিলে, বঙ্কিমচন্দ্রের নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমের রচনা

থেকে বাংলার শিক্ষিত হিন্দু উনিশ শতকের শেষ কয়েক দশকে, একটা আত্ম-গৌরবের চেতনা অর্জন করেন। (এই প্রসংগে রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-৯৯) এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-৯৪) স্মরণীয়, কিন্তু তাঁদের প্রভাব বঙ্কিমের মত ব্যাপক ছিল না মনে হয়।) এর ফলে একদিকে জাতীয়তাবাদের ভাব পুষ্ট হয়, অন্যপক্ষে রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর এবং কিয়দংশে কেশব সেন পর্যন্ত হিন্দুসমাজের অভ্যন্তরে সামাজিক রীতিনীতি ও আচারের বিরুদ্ধে যে সংস্কার আন্দোলন সক্রিয় ছিল বঙ্কিম প্রভাবিত হিন্দুগৌরবের প্রেরণা তার প্রতিবন্ধক হয়। বঙ্কিম স্বয়ং বহুবিবাহ-নিরোধ আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের বিরোধিতা করেন, যদিচ প্রথা হিসেবে বহুবিবাহ কাম্য এ দাবী তিনি করেননি। বিধবাবিবাহের সমর্থনেও তাঁর প্রবল কুণ্ঠা ছিল।

অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে বঙ্কিমের যে দান তা এদেশে বহুকাল উপেক্ষিত হয়েছে। তার কারণও বোধহয় অননুমেয় নয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল সম্বন্ধে তাঁর চেয়ে স্পষ্টত বাংলা ভাষায় আর কেউ লিখেছেন বলে আমি জানি না। যদিও তাঁর বিচারের যা স্বাভাবিক পরিণতি—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উচ্ছেদ—সেই দাবী থেকে তিনি স্বয়ং সচেতনভাবে পশ্চাদপসরণ করেছিলেন। কিন্তু তবুও তাঁর বিশ্লেষণ এত স্পষ্ট, এবং বক্তব্য এত তীক্ষ্ণ ও লক্ষ্যবেধী যে, তাঁর অনুরাগী শিক্ষিত সম্প্রদায়, যাঁরা স্বয়ং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আশ্রয়পুষ্ট, তাঁদের পক্ষে তা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। সেই কারণেই নীরবতার নিশ্ছিদ্র দেয়াল রচনা করে তাঁরা তন্মধ্যে 'বঙ্গদেশের কৃষক'কে সমাধিস্থ করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে বঙ্কিম স্পষ্টত বলেন, 'কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিশ মহাভ্রমে পতিত হইয়া প্রজাদিগের আরো গুরুতর সর্ব্বনাশ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, জমীদারদিগের জমীদারীতে চিরস্থায়ী স্বত্ব নাই বলিয়াই জমীদারীতে তাঁহাদিগের যত্ন হইতেছে না। জমিদারীতে তাঁহাদিগের স্থায়ী অধিকার হইলে পর, তাহাতে তাঁহাদের যত্ন হইবে। এই ভাবিয়া তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃজন করিলেন। রাজস্বের কণ্ট্রাক্টরদিগকে ভূস্বামী করিলেন।'

'তাহাতে কি হইল? জমীদারেরা সে প্রজাপীড়ক সেই প্রজাপীড়ক রহিলেন। লাভের পক্ষে, প্রজাদিগের চিরকালের স্বত্ব একেবারে লোপ হইল। প্রজারাই চিরকালের ভূস্বামী, জমীদারেরা কস্মিন কালে কেহ নহেন—কেবল সরকারী তহশীলদার। কর্ণওয়ালিশ যথার্থ ভূস্বামীর নিকট হইতে ভূমি কাড়িয়া লইয়া তহশীলদারকে দিলেন। ইহা ভিন্ন প্রজাদিগের আর কোন লাভ হইল না। ইংরাজ রাজ্যে বঙ্গদেশের কৃষকদের এই প্রথম কপাল ভাঙ্গিল। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মাত্র…। ইংরাজদিগের এ কলঙ্ক চিরস্থায়ী; কেন না, এ বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী[১]

অথচ এতদূর পর্যন্ত স্পষ্ট বিশ্লেষণের পরেও তাঁকে বলতে শুনি: "আমরা পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারি যে, দশশালা বন্দোবস্তের[২] ধ্বংস আমাদিগের কামনা নহে বা তাহার অনুমোদনও করি না। ১৭৯৩ সালে যে ভ্রম ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহার সংশোধন সম্ভবে না। সেই ভ্রান্তির উপর আধুনিক বঙ্গ সমাজ নির্ম্মিত হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গ সমাজে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। **আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি।**…(বড় অক্ষর আমার) আমরা কেবল ইহাই চাহি যে সেই বন্দোবস্তের ফলে যে সকল অনিষ্ট ঘটিতেছে, এখন সুনিয়ম করিলে তাহার যতদূর প্রতীকার হইতে পারে তাহাই হউক[৩]।"

বাঙালী স্বচ্ছল সমাজের অংশ হিসেবে, উচ্চ শ্রেণীর আর্থিক বনিয়াদকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে গিয়ে সভয়ে ফিরে এসেছেন। সেই বনিয়াদ যত-ই অন্যায়মূলক হোক, এবং সে অন্যায় তাঁর কাছে যত-ই স্পষ্ট হোক, তবু তাকে মেনে না নিয়ে পারেন নি।

১। বঙ্গদেশের কৃষক, ৪র্থ পরিচ্ছেদ: বিবিধ প্রবন্ধ ২য় ভাগ, পৃঃ ২৬৫-৬৬, সাহিত্য পরিষৎ শতবার্ষিকী সংস্করণ।

২। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভিত্তি। প্রথমে দশবছরের জন্যে চালু হয়ে ১৭৯৩ তে চিরস্থায়ী করা হয়।

৩। বঙ্গদেশের কৃষক, বিবিধ প্রবন্ধ ২য় ভাগ পৃ ২৭৩, (শ. স.)

বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক তাত্ত্বিক হিসেবে অবশ্য তিনি পরিণত বা স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিতে পারেন নি। যে সামাজিক সহানুভূতি ও পর্যবেক্ষণ তাঁর ছিল, তার তত্ত্বগত ভিত্তি তাঁর চিন্তার অগোচর ও বিচারে অনুপস্থিত ছিল। সেক্ষেত্রে তিনি ইংরেজি বিদ্যালয়ে উনিশ শতকের অবাধ বাণিজ্য বা free trade-এর পাঠ অভ্রান্ত জ্ঞানে সন্তুষ্ট ছিলেন দেখা যায়। Protection বা শুল্ক সংরক্ষণ সম্বন্ধে ঐ বঙ্গদেশের কৃষকে-ই যে নঙর্থক্ যুক্তিবিস্তার চোখে পড়ে তা থেকেই তা স্পষ্টত প্রতিভাত হয়। তাঁর বক্তব্য, বিদেশী পণ্য, যেমন কাপড়ের থান কিনলে দেশের ক্ষতি নেই, লাভ আছে। কিন্তু "তার্কিক বলিবেন, তাঁতির ক্ষতি আছে। এই থানের আমদানির জন্য তাঁতির ব্যবসায় মারা গেল। তাঁতি থান বুনে না ধুতি বুনে। ধুতি অপেক্ষা থান সস্তা, সুতরাং লোকে থান পরে, ধুতি আর পরে না। এজন্য অনেক তাঁতির ব্যবসায় লোপ হইয়াছে ৪।"

কিন্তু এই স্পষ্ট যুক্তি তাঁর সমাজবিচ্ছিন্ন ইংরেজি-শিক্ষায় শিক্ষিত মানসকে আদৌ প্রভাবিত করেনি। ইংরেজের চাকরি নির্ভর মধ্যবিত্ত জীবনের পরিসর থেকে তিনি স্বচ্ছন্দে বলেন, "উত্তর। তাহার (অর্থাৎ তাঁতির) তাঁতবুনা ব্যবসায় লোপ পাইয়াছে বটে, কিন্তু সে অন্য ব্যবসায় করুক না কেন? অন্য ব্যবসায়ের পথ রহিত হয় নাই। তাঁত বুনিয়া খাইতে পায় না, কিন্তু ধান বুনিয়া খাইবার কোন বাধা নাই ৫।......'

সামাজিক উৎপাদনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাবর্জিত চাকুরিজীবী মানসে এই সত্য প্রতিভাত হয় না যে, সামাজিক মূলধন পড়ে-পাওয়া সামগ্রী নয়। তার যোগান সংকুচিত ও দরিদ্রের অনায়ত্ত। এক বৃত্তি লুপ্ত হলে অন্য ব্যবসায়ের পথ কল্পনার রাজ্যে রহিত না হলেও, বাস্তবে, সম্পদের তা প্রাচুর্যবশতই অনুপস্থিত। বিশেষত এক শিল্পে যে শ্রমিক দক্ষতা অর্জন করেছে, অন্য কোনো শিল্পে বা বৃত্তিতে, সে নতুন শিক্ষা ও সামাজিক সাহায্য ব্যতীত আত্মনিয়োগ করতে পারে না।

৪। বিবিধ প্রবন্ধ ২য় ভাগ ঐ, পৃঃ ২৭৬

৫। ঐ, পৃঃ ২৭৭

এবং সামাজিক সাহায্য না থাকলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে-ই বৃত্তিলোপের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্ন ও বংশলোপ ঘটে। বস্তুত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও কলেজী শিক্ষা, এই দুয়ের বিরাট বিচ্ছেদ যে ঔপনিবেশিক মধ্য শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য, বঙ্কিমের বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক আলোচনায় তা বিশেষত চোখে পড়ে।

বিশুদ্ধ রাজনৈতিক প্রেরণার জনক হিসেবেই বঙ্কিম বাংলাদেশে একদা বিশেষত বন্দিত হন। পরবর্ত্তীকালে এই রাজনীতির কারণেই তাঁকে বিশেষত নিন্দিত হতে হয়। দেশপ্রেমকে ধর্ম বলে ঘোষণা করে, রাজনীতিক আদর্শ ও প্রয়োজনের সঙ্গে ধর্মীয় ধারণার সেতুবন্ধ রচনা করে, একদিকে যেমন তিনি জাতীয়তাবাদের আদর্শকে তৎকালীন চেতনার আয়ত্ত করে তোলেন—অপরপক্ষে, পরবর্তীযুগের রাজনীতিক বিকাশে তাঁর মতাদর্শ অনেকের বিবেচনায় বাধাস্বরূপ হয়। বঙ্কিমের সমালোচকরা বহুক্ষেত্রে বঙ্কিমকে যে দোষে দোষী করেছেন, তাঁরা স্বয়ং সর্বাগ্রে সে দোষে দুষ্ট—বা আরো স্পষ্টত বঙ্কিমের সাম্প্রদায়িকতা যাঁদের ক্রোধের কারণ হয়েছে তাঁরা অনেকেই স্বয়ং সাম্প্রদায়িক, এই বাস্তব সত্য স্বীকার করে নিলেও, বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি কি তা অবশ্য-ই তর্কাতীত নয়। জাতি বলতে তিনি কি মনে করেছেন, তাঁর আনুগত্য বিশেষ কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠীর প্রতি কি না, এ প্রশ্নগুলি আজো সজীব।

অনুরূপভাবে, স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধের পারস্পরিক ভিত্তি কি অথবা বিবাহিত জীবনের রূপ কি বা কি হওয়া উচিত, এ বিষয়েও বঙ্কিমের মতামত একদা যথেষ্ট বিচার-বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। এই সমস্ত মতামতের নিজস্ব মূল্য ছাড়াও অপর এক মূল্য আছে। শার্লে ফুরিয়ের (১৭৭২-১৮৩৭) উল্লেখ করেন যে সমাজে স্ত্রীজাতির অবস্থা থেকেই সমাজ-প্রগতির মান নির্ণয় করা যায়। এই বক্তব্যকে আরো একটু প্রসারিত করে বলা চলে যে, কোন সমাজ দার্শনিকের চিন্তা কতটা অগ্রসর সেটা বোঝা যায় সমাজে নারীর স্থান ও অধিকার সম্বন্ধে তাঁর উক্তি থেকে।

সূচনায় যেটুকু বলেছি তার থেকে বঙ্কিমের চিন্তার বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা পরিস্ফুট হবে। তিনি সচেতনভাবে মানুষের—তাঁর দেশের মানুষের, সমগ্র সামাজিক অস্তিত্বের বিষয় চিন্তা করেছিলেন। তাদের বোধবিশ্বাস, জাতীয় উৎস, আর্থিক সমস্যা এবং নৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা ও তার সম্ভাব্য সমাধান—সর্ব বিষয়েই সচেতনভাবে অনুশীলন করেন তিনি। ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর যে চিন্তা ও দান, তা ছাড়া ও তাঁর প্রতিভার প্রসার এত বিপুল যে একটি আলোচনার আয়তনে তার সম্পূর্ণ আলোচনা সম্ভব হবে না। এবং যে সব বিষয়ে তিনি আগ্রহী ছিলেন তার একাধিক অঙ্গ, যেমন হিন্দু ধর্মশাস্ত্র, আমার আয়ত্ত নয়। সুতরাং আমার বিচার সীমাবদ্ধ হবে মূলত তাত্ত্বিক ও সমাজ-দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্রের উপর। বলাবাহুল্য হলেও হয়ত বলা দরকার যে, রাজনীতি ও অর্থনীতি এই সামগ্রিক সমাজদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। আলোচনার প্রয়োজনে প্রধানত বঙ্কিমের প্রবন্ধসাহিত্যের উপরে-ই আমি নির্ভর করেছি, যদিও, ক্ষেত্র বিশেষে তাঁর উপন্যাস—বিশেষত তৃতীয় যুগের উপন্যাসের উল্লেখ করতে ইতস্তত করিনি।

যে কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের বিচারে তাঁর কালের বিচার, অনুসন্ধানীর প্রাথমিক কর্তব্য। কারণ শুধু এই নয় যে কোন ব্যক্তি-ই ত্রিশংকু নন, সামাজিক অস্তিত্ব ইতিহাস-বিচ্ছিন্ন নয়। কোন বিশেষ কালে মানুষের চিন্তা ও কর্মের সঙ্গে তৎকালীন অবস্থার জীবন্ত যোগাযোগ বর্তমান। এছাড়াও ব্যক্তির বিচারে কালের বিচার প্রয়োজন এই কারণে যে, বিভিন্ন বোধ, বিশ্বাস ও ধারণার সমবায়ে প্রত্যেক যুগের এক বা একাধিক মানসমণ্ডল থাকে, অপর যুগে তার আভাস পাওয়া গেলেও তার জীবন্ত উপস্থিতি অনেক সময়ে-ই অনুভব করা যায় না। বোধ করি এই কারণেই ক্রোচে সমস্ত ইতিহাসকে মিথ্যা আখ্যা দিয়েছিলেন। এক যুগের নর্ম (norm) অপর যুগে পরিবর্তিত হয়, একই সমস্যা অন্যরূপে প্রতিভাত হয়, যা এককালে স্বভাবের ভিত্তি বলে গণ্য ছিল, তা সংস্কারের আধার বলে পরিত্যক্ত হয়, যা সম্ভবের সীমা বলে নির্দিষ্ট ছিল, তা দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় যখন এক

যুগ তার পূর্বগামী যুগ অথবা তদীয় যুগন্ধর পুরুষের সমালোচনায় অবতীর্ণ হয় তখন অবিচারের সম্ভাবনা ঘটে পদে পদে। কারণ প্রাক্তন যুগের অমীমাংসিত প্রশ্নগুলি আজ বহুক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে সিদ্ধ, প্রাক্তন যুগের সীমাবদ্ধ পরিপ্রেক্ষিতে আজকের বিচারক বদ্ধ নন, যদিও আজকের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বন্দী, যার দুর্বলতা অবশ্যই আগামীকালে ধরা পড়বে। এমতাবস্থায় বর্তমানের বিচারক সহজেই বিজ্ঞতার দাবী করতে পারেন, যদিও তার উৎস তাঁর মহত্তর বিচার-বুদ্ধিতে সন্নিহিত নয়, কেবলমাত্র কালগত ব্যবধানে তার উদ্ভব। হয়ত এছাড়া অন্য কোন গত্যন্তরও নেই, কারণ আমরা যদি আমাদের সমস্ত পিতৃপুরুষের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ও সতর্ক না হতাম, তাঁরা যে বিন্দুতে ইতি করেছেন সেইখানে আরম্ভ করতে না পারতাম, তা হলে সমাজপ্রগতি অসম্ভব হত। তবু অতীতের বিচারে সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিত বা তৎকালীন মানসমণ্ডল বিস্মৃত হওয়া অনুচিত, কারণ বর্তমানের মাত্রায় অতীতের বিচার, অবিচার ব্যতীত আর কিছু নয়। আজকে যে সমস্যার রেখাবয়ব স্পষ্ট সেদিন তা অস্পষ্ট ছিল, আজকে যা সমাজজীবনের অঙ্গ, যেমন, স্ত্রী শিক্ষা, সেদিন তা কয়েকজন দুঃসাহসিকের স্বপ্নমাত্র ছিল। সমগ্রভাবে অতীতের বিচারে এই বোধ যত প্রাসঙ্গিক, ব্যক্তিত্বের বিচারে এই ধারণার গুরুত্ব তদপেক্ষা অধিক মনে করি। কারণ একজন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত কালের পুতুলমাত্র।

বঙ্কিমের কাল ও সামাজিক উৎস বিচার করলে তাঁকে ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দু ভদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিভূবলে স্বীকার করতে হয়*। এবং আমার ধারণায় তিনি সেই শ্রেণীর মানস-সংকটের প্রতীকও। কিন্তু সে বিচার ক্রমশ প্রকাশ্য।

বাংলার ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পীঠস্থান ভট্টপল্লীর অতি নিকটে কাঁঠাল-পাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর কৈশোরও অতিক্রান্ত হয় সেখানে। আচারনিষ্ঠ হলেও তাঁর পিতা ছিলেন ইংরেজ সরকারের পদস্থ চাকুরে, ডেপুটি কলেক্টর। যে বৎসর বঙ্কিমের জন্ম হয়, সেই বৎসর-ই (১৮৩৮)

* পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য

আদালতে সরকারী ভাষা হিসাবে ফার্সী পরিত্যক্ত হয়ে ইংরেজী প্রচলিত হয়। রাজনারায়ণ বসু বর্ণিত সেকাল, যেকালে নবাবী আমলের ছাপ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাংলার শিক্ষিত সমাজের আদব-কায়দা ও ভাষা ব্যবহারের মধ্যে সুস্পষ্ট ছিল, সেইকাল অবলুপ্ত হল। বঙ্কিম বেড়ে ওঠেন বাংলার নবযুগের পরিণতির সংগে সংগে। তাঁর জন্মের তিন বৎসর পূর্বে (১৮৩৫) মেকলের অনুকূল সুপারিশে এদেশে ইংরেজি শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু হয়। তাঁর জন্মের পাঁচ বৎসর (১৮৪৩) পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং বিদ্যাসাগরের হাতে বাংলা ভাষার প্রথম সাহিত্যিক রূপ (বেতাল পঞ্চবিংশতি-১৮৪৭) যখন স্ফূর্তিলাভ করে, তখন তিনি নবমবর্ষীয় বালক। নবীন বঙ্গ সাহিত্যের ও চিন্তাধারার এই দুই উৎসের সংগে বাল্যেই তাঁর পরিচয় ঘটে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন স্কুল বিভাগের প্রধান পরীক্ষায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৭৭৪ শকাব্দ ১০৫-১১৬ সংখ্যা) ও বেতাল পঞ্চবিংশতি তাঁর পাঠ্য ছিল। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি কবি ঈশ্বর গুপ্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁর সম্পাদিত সেকালের সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন সংবাদপত্র, সংবাদ প্রভাকরের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। সর্বোপরি তিনি-ই সদ্য প্রতিষ্ঠিত (১৮৫৭) কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট।

নবযুগ একটি শব্দ যার দ্বারা সমাজ-জীবনের ও চিন্তার বিভিন্ন অঙ্গের পরিবর্ত্তন নির্দেশ করা হয়। বিভিন্ন সমাজে নবযুগের প্রকাশ-বৈচিত্র্য স্বীকার করে নিয়েও নবযুগের সামান্য লক্ষণ হিসেবে সম্ভবত দুটি মূল বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করা চলে—(১) সত্য-নির্ণয়ে আপ্ত বাক্য বা দৈবোদ্ভাসনের (Divine revelation) উপর নির্ভর না করে অভিজ্ঞতা ও তার ভিত্তিতে যুক্তি-প্রয়োগের সাহায্য গ্রহণ এবং (২) ধর্ম, শ্রেণী বা স্ত্রী-পুরুষের ভেদ নির্বিশেষে মানুষের মনুষ্য-মর্যাদার ধারণা বা মানবিকতা।

বলা বাহুল্য, এই দুই মূল ভাব সর্বদা সমান স্পষ্টত স্বীকৃত বা ঘোষিত হয়নি। ইয়োরোপীয় ইতিহাসে রিফরমেশনের প্রেরণা বাইবেলের অলৌকিক সত্যতায় ঐকান্তিক আস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত।

ক্যাথলিকদের তুলনায় কালভাঁ-পন্থীরা (Jean calvin ১৫০৯—১৫৬৪) অল্প অনুদার ছিলেন না। তবু প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি প্রশ্নহীন অন্ধ আনুগত্যে অনাস্থা প্রকাশ করে-ই তাঁরা আপ্ত বাক্যের সর্বময় কর্তৃত্বের মূল শিথিল করেন। ধর্মসংক্রান্ত প্রশ্নে বিবেকসম্মত বিচারের দাবী উত্থাপন করে শেষ পর্যন্ত যুক্তি-প্রয়োগের পথ রচনা করেন। নবযুগ ও তার চরিত্র-লক্ষণ এত জটিল এবং তার কয়েক শতাব্দী-ব্যাপী ইতিহাসে এত বিভিন্ন আন্দোলন ও স্ব-বিরোধী ধারা বর্তমান যে, সে সম্বন্ধে যে কোন সাধারণ সূত্র-ই রচনা করা যাক না কেন, মনে হয় তা অসম্পূর্ণ হবে, এবং সেই কারণে সম্পূর্ণ সত্য হবে না। তবু যদি নবযুগের উৎস সন্ধান করতে হয় তবে বলা যায় যে, প্যাগান (pagan) জীবনবাদ ও সমৃদ্ধ কল্পনায় তার প্রাণের স্পন্দন, বেকন ও দেকার্তের দর্শনচিন্তা তার মানস-মণ্ডল ও চিন্তার ভিত্তি, বাণিজ্য-বিস্তারে তার প্রাথমিক প্রতিষ্ঠা এবং ব্যক্তি-বিবেকের প্রাধান্য ঘোষণাই তার নৈতিক মেরুদণ্ড। অষ্টাদশ শতকের ফরাসী বিপ্লব এই নবযুগের সমগ্র সঞ্চিত ঐতিহ্যকে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রূপান্তরিত ও জীবন্ত করে। সেই একই কালে রুশো, বার্নস ও হার্ডারের রোমান্টিক মানবিকতা মনুষ্য-মর্যাদার ধারণাকে গভীর ও ব্যাপক প্রেরণায় সঞ্জীবিত করে। প্রায় একই সময়ে, অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লব যেমন সমাজ ব্যবস্থায় নবযুগের বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব করে তোলে, অন্যদিকে তার বিভিন্ন স্ব-বিরোধী ধারার স্বরূপ ও অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বও সুস্পষ্ট করে। বস্তুত সামাজিক ও অর্থনীতিক চিন্তা ও সমাজবিন্যাসে বর্তমান যুগের সূচনা হয় শিল্প-যুগের উদ্ভব ও বিকাশের সংগে সংগে। শিল্প-বিপ্লবের পরবর্তী নতুন কাল বাস্তব রূপ নেয় পশ্চিম ও ক্রমে মধ্য ও পূর্ব ইয়োরোপে নাগরিক নির্বিত্ত শ্রেণীর বিকাশে এবং এশিয়া ও আফ্রিকায় সাম্রাজ্য শাসন ব্যবস্থার প্রসারে। পরে এই উভয় শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধে। সাধারণতঃ যা পুঁজিবাদ বা ক্যাপিটালিজম নামে আখ্যাত, উপরোক্ত দুটি সত্তা-ই তার সৃষ্টি।

বলা বাহুল্য বাংলার নবযুগের চরিত্র ইয়োরোপীয় নবযুগের থেকে

স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্যের বিশদ প্রকৃতি এখনও ভারতীয় ঐতিহাসিকদের আলোচনার অধীন। তবু বহিরঙ্গ বিচারেও এটুকু স্বত-ই দৃষ্টিগোচর যে বাংলা তথা ভারতে এই নবযুগের প্রেরণা আভ্যন্তরীণ শক্তির দ্বন্দ্বে উদ্ভূত হয়নি, এর উদ্ভব বহিঃশক্তির অভিঘাতে। সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থায় প্রাচীন আর্থিক ও রাজনীতিক ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়ে নতুন পরিবেশ সৃষ্ট হবার ফলে, প্রাচীন চিন্তা ও মূল্যমানের যে পুনর্বিচার অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে তার-ই পরিণামফল বাংলার নবযুগ।

এই পুনর্বিচারের প্রেরণা যাঁর মধ্যে প্রথম সবচেয়ে স্পষ্ট ও প্রাণবন্ত রূপ লাভ করে তিনি নিঃসন্দেহে রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)। ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে প্রাচীন প্রথার উপর ঐকান্তিক নির্ভরতা ত্যাগ করে যুক্তিপূর্ণ বিচারের প্রয়োজনীয়তা তিনি-ই প্রথম উল্লেখ করেন। যথা ঃ "এ স্থানে এক আশ্চর্য এই যে অতি অল্পদিনের নিমিত্ত আর অতি অল্প উপকারে যে সামগ্রী আইসে তাহার গ্রহণ অথবা ক্রয় করিবার সময় যথেষ্ট বিবেচনা সকলে করিয়া থাকেন আর পরমার্থ বিষয় যাহা সকল হইতে অত্যন্ত উপকারি আর অতি মূল্য হয় তাহার গ্রহণ করিবার সময় কি শাস্ত্রের কি যুক্তির দ্বারা বিচার করেন না, আপনার বংশের পরম্পরা মতে আর কেহ কেহ আপনার চিত্তের যেমন প্রাশস্ত্য হয় সেইরূপ গ্রহণ করেন এবং প্রায় কহিয়া থাকেন যে বিশ্বাস থাকিলে অবশ্য উত্তম ফল পাইব। কিন্তু একজনের বিশ্বাস দ্বারা বস্তুর শক্তি বিপরীত হয় না যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, দুগ্ধের বিশ্বাসে বিষ খাইলে বিষ আপনার শক্তি অবশ্য প্রকাশ করে" ৬।

নবযুগের যে চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, এর চেয়ে তার কোন স্পষ্ট প্রকাশ সচরাচর চোখে পড়ে না। বিশ্বাস, সত্য-নির্ণয় বা জ্ঞান-লাভের পন্থা নয় এবং লোকাচার ও ঐতিহ্য এক নয়। ঐতিহ্য-নির্ণয়ের প্রয়োজনেই শাস্ত্র-বিচারের আবশ্যকতা। সর্বোপরি শাস্ত্রকেও যুক্তির দ্বারা বিচার করা

৬। ঈশোপনিষৎ জুলাই ১৮১৬, রামমোহন গ্রন্থাবলী প্রথম খণ্ড, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণঃ পৃঃ ২০০।

প্রয়োজন। বস্তুর গুণ আমাদের ধারণা-নিরপেক্ষ। আধ্যাত্মিক সত্য-নিরূপণে আর্থিক যাচাই-এর উপমাও প্রণিধানযোগ্য।

নবযুগের অপর এক মৌল বৈশিষ্ট্য, মানবিকতার বোধও রামমোহনের রচনা ও কার্যে মুখর। স্বভাবতই এই মানবিকতা প্রকাশ পেয়েছিল নারীর বাঁচার অধিকারের দাবীতে। কারণ তৎকালীন সামাজিক পরিবেশে সেই দাবী-ই ছিল মানবিক অধিকারের প্রথম ধাপ। তাই আমরা আদৌ বিস্মিত হই না যখন দেখি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত সহমরণ বিষয়ে 'প্রবর্তক-নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ'-এ রামমোহন বলেন, "দেখ কি পর্য্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা তাহারা কেবল ধর্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে, অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ দশ পোনর বিবাহ অর্থের নিমিত্ত করেন, তাহারদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাত হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত দুই চারিবার সাক্ষাৎ করেন......আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্য বর্ণের মধ্যে যাহারা আপন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করেন তাহারদের বাটিতে প্রায় স্ত্রীলোক কি কি দুর্গতি না পায়? বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন......নীচ লোক ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে যাহারা সৎসঙ্গ না পায় তাহারা আপন স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ ত্রুটি পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সন্দেহ তাহারদের প্রতি হইলে চোরের তাড়না তাহারদিগকে করে—অনেকেই ধর্মভয়ে লোকভয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে যদ্যপিও কেহ তাদৃশ যন্ত্রণায় অসহিষ্ণু হইয়া পতির সহিত ভিন্নরূপে থাকিবার নিমিত্ত গৃহত্যাগ করে তবে রাজদ্বারে পুরুষের প্রাবল্য নিমিত্ত পুনরায় প্রায় তাহারদিগকে সেই সেই পতি হস্তে আসিতে হয়, পতিও সেই পূর্ব্বজাত ক্রোধের নিমিত্ত নানা ছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়, কখন বা ছলে প্রাণ বধ করে; এ সকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ......নানা দুঃখে দুঃখিনী তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধন পূর্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায় ৭।"

১৮১৪-তে রামমোহন কলকাতায় স্থায়ী বসবাস শুরু করেন।

৭। রামমোহন গ্রন্থাবলী ৩য় খণ্ড পৃঃ ৪৬-৪৭, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ।

১৮৩০-এর শেষে (নভেম্বরে) তিনি কোলকাতা তথা ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। বাংলার সমাজ সংস্কারের প্রথম কীর্তি সতীদাহ প্রথা নিবারণ এই সময়ে—১৮২৯ খৃষ্টাব্দে কার্যকরী হয়।

রামমোহন যখন সামাজিক রীতি-নীতির সংস্কার ও ধর্ম-বিশ্বাসের পরিবর্তন-কল্পে আত্মনিয়োগ করেছেন তখন আর এক ঘটনা বাংলার হিন্দু সমাজকে নবযুগের প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মত আঘাত করে। আমি হিন্দুকলেজ ও উক্ত কলেজে শিক্ষিত ইয়ংবেঙ্গল নামে বিখ্যাত যুবকদের কথা বলছি। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারিতে রামমোহন, ডেভিড হেয়ার এবং স্যর হাইড ইস্ট ও বৈদ্যনাথ রায় (রাজা) প্রভৃতির, অনুপ্রেরণায় ও আনুকূল্যে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়।

কিন্তু হিন্দু কলেজের বিশুদ্ধ বুদ্ধিকেন্দ্রিক আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব, ছাত্রদের জীবনে ও বৃহত্তর সমাজে অনুভূত হতে থাকে ১৮২৬-এর মে মাসে উনিশ বছরের তরুণ হেনরি ডিভিয়ান ডিরোজিয়ো-কে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের পর। রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮), তারাচাঁদ চক্রবর্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রভৃতি ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠির সকলে-ই ডিরোজিয়োর প্রভাবে গড়ে ওঠেন। ঠিক এর চারবৎসর পরে ১৮৩১-এর মে মাসে, রক্ষণশীলদের মিথ্যা প্রচারে এবং সাহেব কর্তৃপক্ষের ক্রুদ্ধ বিরক্তিতে ডিরোজিও পদত্যাগে বাধ্য হন। ঐ বৎসরের ২৬ ডিসেম্বর তিনি কলেরা রোগে মারা যান।

মাত্র চার বৎসরের শিক্ষকতা কালে এই তরুণ কবি-প্রতিভাসম্পন্ন ইউরেশীয়, বাঙ্গালীর জীবনে ও চিন্তায় একটি যুগসৃষ্টি করে যান। তিনি ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। ছাত্রদের তিনি ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা ও আলোচনা করতে এবং চিন্তালব্ধ সত্যের ভিত্তিতে সমস্ত রীতি-নীতিকে যাচাই করে, জীবনযাপন করতে উদ্বুদ্ধ করেন। এই স্বাধীন চিন্তা এবং চিন্তা অনুযায়ী জীবন যাপনের চেষ্টার ফলে-ই তাঁর ছাত্রেরা দেশজ হিন্দুয়ানীতে আস্থা হারান, জাতিভেদ ও শুদ্ধাচারের বিধিগুলি প্রকাশ্যে লঙ্ঘন করতে

আরম্ভ করেন এবং সমাজপতিদের ক্রোধ ও ঘৃণা জাগিয়ে তোলেন। রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রশ্নে তাঁদের বিচারশীল মুক্ত দৃষ্টি, দেশী ও বিদেশী উভয় শ্রেণীর কর্তৃপক্ষকে ভীত করে তোলে। আজও পর্য্যন্ত ডিরোজিও-র শিষ্যদের কতকগুলি হঠকারী যুবা রূপে চিত্রিত করার একটা প্রচেষ্টা চোখে পড়ে। যেন প্রকাশ্যে মদ্যপান ও গোমাংস ভক্ষণ ব্যতীত আর কিছু-ই তাঁরা করেন নি, এবং তাঁদের সমাজ-সংস্কার মদ্যমাংসে-ই সম্পূর্ণ ছিল।

সন্দেহ নেই যে, ডিরোজিওর শিষ্যবর্গ প্রথম যৌবনের অনভিজ্ঞতা, আবেগ ও তারল্য বশত অনেক হঠকারিতা করেছিলেন এবং এমন কাজ করেছিলেন যাতে বিরোধীপক্ষ-ই জোরদার হন। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, ক্রিয়ার গতিবেগের উপরেই প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা নির্ভর করে। যখন মুসলমানের সেঁকা পাঁউরুটি প্রকাশ্যে ক্রয় করাও ঘোর বিপ্লবাত্মক কাজ রূপে স্বীকৃত, তখন যারা বিপ্লবাকাঙ্ক্ষী, তাদের পক্ষে প্রকাশ্যে গোমাংস ভক্ষণ ইত্যাদি অস্বাভাবিক কাজ বলা যায় না।

কিন্তু ডিরোজিও-র শিষ্যগণ নবযুগের ইতিহাসে যে জন্যে বিশেষত স্মরণীয় হয়ে আছেন তা নিছক তাদের পানাহারের বৈশিষ্ট্যের জন্যে নয়। তাঁরা স্মরণীয় হয়ে আছেন প্রধানত দুটি কারণে। (১) তাঁরা-ই প্রথম নির্দ্বিধায় স্বাধীন বিচার করে সত্যকে নির্ণয় করতে অগ্রসর হন, এবং শুধু তাই নয়, নির্নীত সত্যের ভিত্তিতে জীবনকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। রামমোহনের শিষ্যেরাও প্রথমে এতদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। তরুণেরা ধারণা ও আচরণের পার্থক্য জীবনে মেনে চলতে অস্বীকার করেন। সংক্ষেপে সত্যনিষ্ঠাকে জীবনে কার্যকরী করেন। (২) তাঁরা-ই সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্মদাতা। তাঁদের *Chackerbutty Faction*-এর পূর্বে এদেশে কোন রাজনৈতিক মতসম্পন্ন অগ্রসর গোষ্ঠির নাম শোনা যায় না। এঁদের নেতৃস্থানীয় রামগোপাল ঘোষ, সেকালে রাজনৈতিক প্রসঙ্গে দেশীয় সমাজের মুখপাত্র ছিলেন। ১৮৪৯-এ বীটন যখন এদেশের ইয়োরোপীয়দের আইনের আওতায় আনার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত

ইংরেজদের বিরোধিতায় বিফল হন, তখন রামগোপাল ঘোষ-ই তার প্রতিবাদ-কল্পে '*A few Remarks on Certain Draft Acts, Commonly Called Black Acts*" রচনা করেন এবং সাম্রাজ্যাভিমানীদের বিরাগভাজন হন। ১৮৫১-তে ব্রিটিশ ইনডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতেও রামগোপাল প্রমুখ ডিরোজিও-শিষ্যদের অগ্রণী-ভূমিকা ছিল। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার কাজে রামগোপাল, সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ সহায়তা করেন। অন্যান্য সমস্ত সমাজ-সংস্কারের কাজেও এঁরা সাহায্য করেছেন। রাজকার্যে উৎকোচ গ্রহণ এঁরা-ই প্রথম বন্ধ করেন।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে, নবযুগের বিকাশে এঁরা নিজেরা কোনো নিজস্ব ও স্থায়ী ফলশ্রুতি রেখে যেতে পারেন নি। তার কারণও সম্ভবত দুর্বোধ্য নয়। যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থায় ফরাসী বিপ্লবের ফলশ্রুতি সম্ভব, ঔপনিবেশিক ভারত তথা বাংলায় তা ছিল না। এঁরা তাই অন্যকে সাহায্য করেছেন, কিন্তু নিজেদের কোনো ক্ষেত্র খুঁজে পান নি, রচনা করতে পারেন নি। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে নিজেদের জীবন-সত্যকে খণ্ডিত না করে পারেন নি। উগ্র সংস্কারক দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, যিনি যৌবনে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় প্রতিষ্ঠা করেন, এবং যিনি,…"বলিতেন যে তিনি যেমন ধর্ম্মসংস্কারক, তেমনি সমাজ সংস্কারক …তিনি বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ ও সিভিল বিবাহ এককালে করিয়াছেন", তিনিও ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার বাহন হিসেবে আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে গিয়ে সরকারী কাজের সুবিধার্থে, "টিকি রাখিয়া পরম হিন্দুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন", এবং "তথাকার একটি ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত আপনার পুত্রের বিবাহ দিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন ৮।"

রাজনৈতিক ও আর্থিক স্বাধীনতা ব্যতীত চিন্তার স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয় না। ইয়ং বেঙ্গলের পরিণামহীনতা তাই শুধু তাঁদের নয়, ঔপনিবেশিক সমাজের ব্যর্থতা ও বন্ধ্যাত্বের ফল। তাঁরা

৮। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, পৃঃ ১১১-১১৩; তৃতীয় সংস্করণ ১৯৫১।

বাংলার নবযুগের ধারাকে শেষ পর্যন্ত প্রভাবিত করতে পারেন নি। এর দ্বারা শুধু তাঁদের নয়, বাংলার নবযুগের-ই খণ্ডিত চরিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়। না, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৃষ্ট ব্যবস্থায় ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) ফলশ্রুতি সম্ভব ছিল না, সম্ভব ছিল না ধর্ম্মনিরপেক্ষ বিশুদ্ধ যুক্তি-নির্ভর সমাজ-বিপ্লব।

অবশ্য বাংলার নবযুগের যে দুর্বলতা রামমোহনের মধ্যেও তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সাম্রাজ্য-ব্যবস্থার প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতেই তা নিহিত। তিনি একাংশে তার বিরোধিতা করেন। সে-যুগে বিদেশীর সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রূপ নিয়েছিল ইয়োরোপীয় খৃষ্টান মিশনারীদের খৃষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রচারে। রামমোহন তার বিরুদ্ধে দাঁড়ান। এই বিরোধিতার কারণ যে শুধু খৃষ্টধর্মের ধর্মনীতি সংক্রান্ত তা নয়, খৃষ্টধর্মের বেশ ধারণ করে ভারতীয় জীবন-বিন্যাসের উপর যে আক্রমণ ও তাচ্ছিল্যের স্রোত নেমে এসেছিল তার থেকে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বা স্বাতন্ত্র্যবোধকে রক্ষা করার প্রেরণাতেই তাঁর উদ্যম প্রকাশ পায়। অবশ্য এই প্রেরণা বিশেষত যাঁর মধ্যে রূপ লাভ করে তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)। তাঁর উদ্যম নিযুক্ত হয় খৃষ্টান প্রভাব থেকে দেশীয় জীবন ও আদর্শ রক্ষার প্রয়াসে। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি মিশনারীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে স্বয়ং একাধিক অবৈতনিক ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তিনি যে 'হিন্দু হিতার্থি বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করেন, তাতে প্রাচীন-পন্থী রাধাকান্ত দেব থেকে সংস্কারক রামগোপাল ঘোষ পর্যন্ত শিক্ষিত হিন্দু সমাজের সকল গোষ্ঠি, তাঁর-ই উৎসাহে মিলিত হয়েছিলেন। যে সমস্ত ঘটনা তথা ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা হিন্দু জাতীয়তার গঠনে কার্যকরী হয় উপরোক্ত ঘটনা নিঃসন্দেহে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বক্ষ্যমান আলোচনা দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধীয় নয়, কিন্তু বাংলার নবযুগে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ স্থান নানা কারণে আলোচ্য মনে করি। নবযুগের যুক্তিবাদ তাঁর চিন্তার ভিত্তি স্বরূপ ছিল না। তাঁর বিখ্যাত আত্মজীবনী থেকে স্পষ্টত-ই পাওয়া যায় যে, দৈবোদ্ভাসন বা Divine

revelation-ই তাঁর সত্যে উপনীত হবার পন্থা ছিল। পরবর্ত্তী যুগে অক্ষয় দত্তের সঙ্গে তাঁর যে মতপার্থক্য দেখা দেয় তার কারণও সত্য-নির্ণয়ে বুদ্ধি-বিচারের স্থান নিয়ে উভয়ের মৌলিক মতপার্থক্য। দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের মূলে ছিল এই বিশ্বাস যে, "এই বেদান্ত শাস্ত্রের প্রচারাভাবে স্বধর্মে থাকিয়া ঈশ্বর জ্ঞান দ্বারা চরিতার্থ না হইয়া নিরাশ্বাসে অনেকে বিজাতীয় খৃষ্টান ধর্ম প্রভৃতি এই ক্ষণে অবলম্বন করিতেছে। স্বধর্মে থাকিয়া ঈশ্বরজ্ঞান দ্বারা চরিতার্থ হইলে কে পরধর্মের আশ্রয় লইবে ?

স্বধর্ম্মে থাকিয়া যাহাতে ঈশ্বর জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় তন্নিমিত্তেই এই পাঠশালা স্থাপিতা (তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা) হইয়াছে ৯।"

যে শংকা ও বেদনা দেবেন্দ্রনাথকে বিচলিত করেছিল তা ঐ উপলক্ষে অক্ষয়কুমার দত্তের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, "এ দেশীয় যথার্থ ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করা অতি আবশ্যক হইয়াছে নতুবা আর কিয়ৎকাল গৌণে ইংরেজদিগের সহিত আমারদিগের কোন বিষয়ে জাতীয় প্রভেদ থাকিবে না।...তাঁহারদিগের ভাষাই এদেশের জাতীয় ভাষা হইবেক তাঁহারদিগের ধর্ম্মই এদেশের জাতীয় ধর্ম্ম হইবেক সুতরাং ব্যক্ত করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে হিন্দু নাম ঘুচিয়া আমারদিগের পরের নামে বিখ্যাত হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি।"

বস্তুত দেবেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুত্বকে রক্ষা করা। কারণ তা না হলে খৃষ্টান ইংরেজের শ্রেষ্ঠত্বের মোহে ভুলে এদেশীয় লোক নিজস্ব পরিচয় বিস্মৃত হবে। conventional বা প্রথাসিদ্ধ এবং conservative বা রক্ষণশীল যে এক নয়, এই কথা যদি আমরা স্মরণে রাখি, তবে আমরা স্বীকার করব যে, বাংলার নবযুগে সবচেয়ে সক্রিয় রক্ষণশীল শক্তি ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর এবং তদীয় সহযোগী রাজনারায়ণ বসুর (১৮২৬-১৮৯৯) এই রক্ষণশীলতা প্রথমাবধি জাতীয় মানসে হীনমন্যতার স্রোত প্রতিরোধ করেছে এবং বাংলা ভাষার

৯। ১৮৪৩, ৩০ এপ্রিল, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপনের উপলক্ষে বক্তৃতা, ভাদ্র ১৭৬৫ শক।

চর্চাকে সাহায্য করেছে এ যেমন সত্য, তেমনি পরবর্তী যুগে বহুক্ষেত্রে সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেছে, তাও তেমনি অনস্বীকার্য।

রামমোহনের জীবনে খৃষ্টীয় শ্রেষ্ঠত্বাভিমানকে বাধা দিয়ে জাতীয় ভাবাদর্শ রক্ষার প্রয়াস প্রত্যক্ষ। বহুলাংশে সেই কারণে-ই তিনি অনুসন্ধানের সাহায্যে জাতির লুপ্ত ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু সাম্রাজ্য ব্যবস্থার যে প্রধান অঙ্গ, তার সর্বনাশা আর্থিক রূপ, সে বিষয়ে তাঁর প্রতিবাদ স্ব-বিরোধী ছিল। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সিলেক্ট কমিটিতে সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে রামমোহন, এদেশীয় কৃষকদের স্থায়ী দুর্দশার কথা উল্লেখ করেছিলেন ১০। প্রচলিত ব্যবস্থার বিলোপ দাবী করেননি তিনি, যদিও প্রজাদের স্বত্ব ও অধিকার রক্ষার জন্যে বিশেষ জোরের সঙ্গে বক্তব্য পেশ করেছিলেন। তিনি জমিদারদের বিপক্ষে প্রজার এবং সরকারের বিপক্ষে জমিদারের পক্ষ নেন। কিন্তু তিনি এবং তাঁর প্রধান অনুরাগীদের মধ্যে অনেকে-ই আর্থিক জীবনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বা আরো ব্যাপকভাবে ইয়োরোপীয় বণিক গোষ্ঠীর সংগে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। নতুন শিক্ষা ও জ্ঞান জাতীয় জীবনের গভীর থেকে আসেনি, এসেছিল ইয়োরোপীয় অনুপ্রবেশের ফলে। সেই একই কারণে জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি—

১০। ১৮৩১-এর ফেব্রুয়ারীতে নিযুক্ত হাউস অব কমন্সের সিলেক্ট কমিটিতে সাক্ষ্যদানের জন্যে রামমোহন আহূত হন, কিন্তু তিনি কমিটির সামনে সরাসরি উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য দেন নি। তিনি তার বক্তব্য লিখিতভাবে *'communications to the Board of control'* হিসেবে পেশ করেন। এগুলি *Parliamentary Blue Books*-এর মধ্যে স্থান পায়। রামমোহন পর বৎসর তার বক্তব্যগুলি সমগ্রভাবে *Exposition of the practical operation of Judicial and revenue system of India* (*London : Smith Elder Co., Cornhill, 1832*) এই শিরোনামায় গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করেন।

দ্রষ্টব্য : *The English works of Raja Rammohan Roy, part* III, *Edited by DR. Kalidas Nag & Debajyoti Burman. Sadharan Brahmo Samaj, Calcutta, 1947.*

কৃষি ও কুটির শিল্পের সংযোগে গঠিত গ্রাম-সমাজ—ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। এবং এই শক্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিলেন, এঁদের সাহচর্যে শিক্ষালাভ করেছিলেন বলে-ই বোধহয় রামমোহন ও তাঁর অনুগামীরা বিশ্বাস করেছিলেন যে ইংরেজের সাহচর্যে-ই শুধু এ-দেশের উন্নতি সম্ভব। রামমোহন দেখেছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন যে ইংরেজ শাসকবর্গ কি অমানুষিক হারে ভারতের সম্পদ শোষণ করে চলেছেন। *Paper on the Revenue system of India*-র *Appendix V*-এ, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অব ডাইরেকটরস্‌দের উক্তি তুলে ধরে তিনি বলেন :

In a letter of the court of Directors to the Government of Bengal dated the 20th of June 1810, and quoted in the work, "On colonial policy as applicable to the Government of India" by a very able servant of the company, now holding a responsible situation in Bengal, the Directors state that "it is no extravagant assertion to advance that the annual remittances to London on account of individuals have been at the rate of nearly 2000, 000*l*. per annum *for a series of years past*. (ইটালিকস মূললেখকের, আমার নয়) From these and other authentic documents the author calculates the amount of capital or the aggregate tribute, public and private, so withdrawn from India from 1765 to 1820 at 110,000,000*l*.

(*The English works of Raja Rammohan Roy vol. III. p. 77.*)

এই অবস্থার প্রতিকার-কল্পে রামমোহন কি ভাবলেন সেটা-ই বিশেষত লক্ষণীয়। এই capital drain বা মূলধনের ক্ষয় যে রোধ

করা যায় সে বিষয়ে তাঁর কোন বিশ্বাস ছিল না, কারণ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্য রোধ করার মত কোন শক্তি স্বদেশে আছে বলে তিনি দেখেননি বা মনে করেননি। দেশের মধ্যে থেকে নতুন উৎপাদন-কৌশল যে কেউ গ্রহণ করতে বা শিক্ষা করতে পারবে সে আস্থাও তাঁর ছিলনা। সমশ্রেণীর স্বজাতীয়দের ব্যবহার দৃষ্টে-ই বোধহয় দেশের মধ্যে নতুন ভাব ও আন্দোলনের শক্তির উপরেও আস্থা ছিল না তাঁর। কাজে-ই তিনি সম্পূর্ণ নির্ভর করলেন বিদেশী শক্তির উপর—এই ক্ষয়ের যা মূল কারণ তাদের উপর—নির্ভর করলেন বিদেশী পুঁজির উপর। বিদেশী শিল্পোৎকর্ষের উপর। সুতরাং তিনি চাইলেন কলোনাইজেশন colonisation বা ইয়োরোপীয় ঔপনিবেশিকদের দ্বারা এই দেশে বসতি-স্থাপন। তিনি আশা করলেন যে এদেশে বিত্তশালী (সর্ব শ্রেণীর নয়) ইয়োরোপীয়রা বসবাস শুরু করলে দেশী পুঁজির দেশান্তর হ্রাস পাবে, কারণ কিছু সংখ্যক বিদেশী, যারা এদেশ থেকে সম্পদ নিয়ে চলে যায় তারা এদেশে-ই স্থায়ীভাবে থেকে যাবে; বিদেশী পুঁজি ও উন্নত উৎপাদন-কৌশলের প্রভাবে দেশের শিল্প, কৃষিও বাণিজ্যের উন্নতি হবে, বিদেশীদের সাহচর্যে দেশীয়দের কুসংস্কার ঘুচবে, তাদের উদ্যোগে শিক্ষার প্রসার হবে, এবং বিদেশীরা নিজেদের জন্যে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা পেলে ক্রমে তা দেশীয়দের মধ্যেও বিস্তৃত হবে, ইত্যাদি।

Questions and Answers on the Revenue system of India-তে দেখি:

Q. 48. Would it be injurious or beneficial to allow Europeans of capital to purchase Estates & settle on them?

A. If Europeans of character and capital were allowed to settle in the country…it would greatly improve the resources of the country, and also the condition of the native inhabtants by shewing them superior methods of cultivation

and the proper mode of treating their labourers and dependants.

Q. 50. How would the settlement on a large scale of Europeans of capital in the country improve its resources ?

A. As a large sum of money is now annually drawn from India by Europeans retiring from it with the fortunes realised there, a system which would encourage Europeans of capital to become parmanent settlers with their families would necessarily greatly improve the resources of the country.

Questions & Answers On the Revenue system of India, Eng. Works Vol. III পৃঃ ৫০-৫২)

বিদেশী পুঁজির প্রসাদে দেশে কি ভাবে শিল্পোৎপাদন ও বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে, তার উদাহরণ হিসেবে রামমোহন নীলচাষের বিস্তারের উল্লেখ করেছিলেন ; এবং নীলচাষের ইতিহাস থেকেই এদেশের মানুষ বিদেশী পুঁজির অপরিসীম ভয়াবহতার অভিজ্ঞতা অর্জন করে ১১। রামমোহনের মত অবহিত ব্যক্তির কাছে আয়রল্যানডের দুর্গতি ও তার কারণও অজানা ছিলনা নিশ্চয়। তাছাড়া তাঁর আশ্চর্য যুক্তিপরায়ণ চিত্তে এটা স্পষ্ট হওয়া স্বাভাবিক বলে মনে হয় যে, বিদেশী পুঁজি যদি স্ব-ধাম ত্যাগ করে এদেশে আসে, তবে তা সম্পূর্ণ নিজের সুবিধার্থে-ই আসবে, এদেশের উন্নতি-কল্পে আসবে না কখনো-ই। বস্তুত শ্রেণীগত অভিজ্ঞতা ও বিচার-বুদ্ধি ছাড়া তাঁর এই দৃষ্টিদৌর্বল্যের আর কোন ব্যাখ্যা

১১। দ্রষ্টব্য : *Remarks on settlement in India by Europenns, Eng. Works. Vol. III* পৃঃ ৮১-৮৫। এই পুস্তিকাটিতেই কলোনাইজেশন-এর সামাজিক ও রাজনৈতিক সুফলের বিষয় বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। তার সারাংশ পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

পাওয়া যায় না। বোধকরি এই জন্যেই দেশের সামগ্রিক আর্থিক জীবনের ক্ষতির দিকটা তাঁর চেতনায় যথোচিত প্রতিফলিত হয়নি। এই কারণে রামমোহনও তাঁর সহযোগী দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রভৃতি দেশে ইংরেজদের বসবাস বা কলোনাইজেশন প্রার্থনা করেছিলেন। ২৬শে ডিসেম্বর ১৮২৯ সমাচার দর্পণের প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী দেখা যায়—

"টোনহলে সভা: শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের ইজারার কাল উত্তীর্ণ হইলে হিন্দুস্থান ও চীনদেশের মধ্যে বাণিজ্য কার্য্য সর্ব্বসাধারণ হয় আর ইউরোপীয় লোকেরা এদেশে আসিয়া তালুকদারী ও কৃষিব্যবসায়ী করিতে পারেন এতদভিপ্রায়ে কলিকাতাবাসী কতকগুলীন সওদাগর ইঙ্গরেজি ও বাঙ্গালী বাবুরা ইংলণ্ডের মহাসভায় দরখাস্ত পাঠাইবার পরামর্শ স্থির নিমিত্ত গত ১৫ ডিসেম্বর মঙ্গলবার টোনহলে এক সভা করিয়াছিলেন.........এতদ্দেশীয়রদিগের মধ্যে ঐ সভায় আর কেহ না গিয়া থাকিবেন কিন্তু কেবল শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, দ্বিতীয় শ্রীযুত বাবু প্রসন্ননাথ ঠাকুর...ইঙ্গরেজী কাগজে লিখিয়াছে অনুমান হয় বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর হইবেন ইহারদিগের অভিপ্রায় ঐ সাহেবেদিগের সহিত ঐক্য হইল..."

ঐ পত্রের ২রা জানুয়ারী ১৮৩০-এর সংখ্যার শ্রীযুত চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু কস্যচিৎ জমীদারস্য যে পত্রটি মুদ্রিত হয় তাতে দেখি "শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রসঙ্গ করিলেন এবং শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাহার সহায়তা করিলেন ঐ পরামর্শসিদ্ধ কথার অভিপ্রায় এই যে, ভারতবর্ষের ব্রিটিস সবজেক্টের ভূমির দখল পাওনের যে প্রতিবন্ধক আছে এবং তাহাতে স্বচ্ছন্দে এতদ্দেশে আগমন পূর্ব্বক বসতির যে নিষেধ আছে তাহাতে এ দেশের বাণিজ্য বা কৃষিকর্ম কি শিল্প কর্মের উন্নতি হওনের মহাব্যাঘাত এবং সেই ব্যাঘাত দূরীকরণার্থে পার্লিয়ামেণ্টে দরখাস্ত দেওন কর্ত্তব্য হয়"।

বর্তমানে অনেকে মনে করেন যে, সে যুগের সাম্রাজ্য ব্যবস্থার ক্ষতিকারক রূপটি চিন্তানায়কদের চোখে পড়েনি বা বোধগম্য হয়নি, কারণ

ইংরেজের সাম্রাজ্য-শাসন তখনো সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং শোষণের রূপ তখনো অত প্রকট হয়ে পড়েনি। তা যে সত্য নয় তা পূর্বেই দেখা গেছে। বস্তুত এ যুক্তি গ্রাহ্য নয়। কারণ সে যুগে-ই শোষণ সবচেয়ে অবাধ ও অব্যাহতরূপে বিরাজিত ছিল। মার্ক্স বর্ণিত Primitive accumulation-ই ছিল তৎকালীন বাণিজ্যনীতির ভিত্তি। সেই যুগ-ই ইতিহাসে বঙ্গ-লুণ্ঠন নামে আখ্যাত। এবং তার চেয়েও যা বড় কথা, সেই যুগেও এ-দেশের অনেকে-ই ব্রিটিশ বাণিজ্যের অনুপ্রবেশের ফলে দেশে যে আর্থিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন। এবং সংবাদপত্রে সে বিষয়ে আলোচনাও হয়েছিল বিস্তারিতভাবে। উক্ত কস্যচিৎ জমীদারস্য পত্রে-ই দেখি……"এদেশে যে প্রকারে কৃষিকর্ম চলিতেছে ইহা এদেশীয়রদের পক্ষে পরম মঙ্গল, তাহার অন্যথা হইলে মহাদুঃখ হইবেক তাহার এক সাধারণ প্রমাণ দেখাই এ দেশের স্ত্রী সকল চরকার সুতা কাটিয়া কালযাপন করিত বিলাত হইতে শিল্প যন্ত্র নির্মিত সুতায় আমদানী হওয়াতে তাহারদিগের অন্নাভাব হইয়াছে"……। এক-ই প্রসঙ্গে এর চেয়েও বিস্তৃততরভাবে সাম্রাজ্য-ব্যবস্থায় জাতীয় অর্থনীতির বিষয়ে আলোচিত হয়েছে ১৮৩০-এর ৯ই জানুয়ারীর সমাচার দর্পণে: "ক্লোনিজেসিয়ন……ইঙ্গরেজ লোক আসিয়া এদেশে ভূমির উপর বসতি করত কৃষিকর্ম ও শিল্পকর্মাদি নানা প্রকার ব্যবসায় করিবেন ইহাতে কাহার কাহার বিবেচনা হইয়াছে যে সাধারণের ঐশ্বর্য্য ও সুখবৃদ্ধি হইবেক এ আশা দুরাশা মাত্র যেহেতুক তাহারদিগের শিল্পবিদ্যাদির ব্যবসার দ্বারা এদেশের লোকের বর্তমান কালে যে দুরবস্থা হইয়াছে তাহার বহু দৃষ্টান্ত আছে জমীদারী বা তালুকদারীর সুখ ঐর্লণ্ড দেশের অবস্থাই দৃষ্টান্ত আছে আর ব্যবসায়ের দৃষ্টান্ত কিঞ্চিৎ দিতেছি……"

অতঃপর উক্ত লেখক বৃটিশ বাণিজ্যিক অনুপ্রবেশের ফলে বিভিন্ন শিল্প-বৃত্তিতে দেশীয় কারিগরদের কি দুরবস্থা হয়েছে তার একটা বিবরণ দিয়েছেন। বিভিন্ন ব্যবসায়ে বিভিন্ন ইংরেজ কোম্পানীর নামোল্লেখ থাকাতে উক্ত বিবরণটির বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে, সেই কারণে তাঁর মূল বিবৃতি উদ্ধৃত করি:—'ইমারতি কর্ম…বিংশতি বৎসরের পূর্বে

যখন এই রাজধানীতে গোরা রাজমিস্ত্রী ছিল না তখন সুলতান, আজদ্দীন, চাঁদ মিস্ত্রী প্রভৃতি অনেক এ দেশীয় মিস্ত্রী ঐ ব্যবসায় করিয়া ধনবান হইয়াছিল……পরে কতকগুলি গোরামিস্ত্রী আসিয়া ঐ কর্ম তাবৎ গ্রাস করিলেন……বুরুস (Bruce ?) স্মাইল (Smile ?) বরণ (Burn ?) করি (Carey ?) প্রভৃতি মিস্ত্রীরা অনেক লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া কর্ণিক ছাড়িয়া কেহ স্বদেশ গমন করিলেন, কেহ বা কলম লইলেন অভাগা বাঙ্গালী মিস্ত্রীরা কর্ণিক ত্যাগ করিয়া পাগড়ি বান্ধিয়াছিল তাহা গিয়া কোদালি হস্তে লইল এক্ষণে অন্নাভাবাপন্ন"।

লক্ষ্যণীয় এই যে, উপরোক্ত আলোচনায় বাঙ্গালী অর্থে হিন্দু মুসলমানের ভেদ করা হয়নি যখন-ই জাতির বাস্তব সমস্যার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তখন-ই জাতি বলিতে কি বোঝায় সে বিষয়ে তর্ক করবার প্রয়োজন ঘটেনি, বাস্তব অভিজ্ঞতা-ই তা স্থির করে দিয়েছে।

উক্ত আলোচক অতঃপর 'বাড়ুই মিস্ত্রীর কর্ম্ম' 'স্বর্ণকারের কর্ম্ম' 'দরজীর কর্ম্ম' 'নৌকার ব্যবসায়' প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তিতে দেশীয় কারিগরদের অবস্থার বিষয় বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। যথা: বাড়ুই মিস্ত্রীর কর্ম্ম। এই কর্ম্মে পূর্ব্বে পাল প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যবন্ত হইয়াছিলেন।…রোল্ট (Rolt) কোম্পানি প্রভৃতি অনেক গোরা বাড়ুই মিস্ত্রী হইয়া ঐ ব্যবসায় ভক্ষণ করাতে…এ দেশীয়েরা সকলে গজ ফেলিয়া বাইশ লইল ইহাতে উদরান্নেরো অনাটন হইয়াছে।

স্বর্ণকারের কর্ম্ম।….হেমিল্টন (Hamilton) কোম্পানি প্রভৃতি আসিয়া ঐ কর্ম্ম করাতে এ দেশীয় স্বর্ণকারদের প্রায় অদ্য ভক্ষ্যাভাব হইয়াছে…

দরজীর কর্ম্ম। এই কর্ম্ম করিয়া রমজান ওস্তাগর প্রভৃতি কত লোক ধন সঞ্চয় করিয়াছিল…পরে গিবসন কোম্পানি প্রভৃতির আগমনে সূচী ব্যবসায়িরা এক্ষণে সূচাগ্রে ভূমি ক্রয় করা দূরে থাকুক অন্নাভাবে সূচের ন্যায় শুষ্ক হইয়া গেল।…

নৌকা ব্যবসায়। পূর্ব্বে দত্ত প্রভৃতি সুলুপাদি ভাড়া দেওন কর্ম্মে বহু ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন সাহেবরা বোট অফিস করিয়া নৌকাদির

ভাড়াদায়ক ও ঘাটমাঝি প্রভৃতির কর্ম্মও কাড়িয়া লইলেন ইহাতে উক্ত ব্যক্তিদের অনেক লক্ষ টাকার স্লুপ ও বজরাদিগর জলে ভাসিতে ভাসিতে জল হইয়া গেল…"

বস্তুত তৎকালীন চিন্তানায়করা এতই সরলমতি ছিলেন যে, নিজেদের চতুষ্পার্শ্বে সামাজিক জীবনে যা প্রতিনিয়ত-ই ঘটছে সে বিষয়ে তাঁরা অজ্ঞ বা- অচেতন ছিলেন, এ কথা মনে করলে তাঁদের বুদ্ধিকে-ই অসম্মান করা হবে শুধু, আর কিছু-ই প্রমাণ করা যাবে না। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁদের ইংরেজপ্রিয়তার মূল ছিল তাঁদের জীবনধারায়। এবং সেই কারণে-ই নিজেদের সমৃদ্ধিকে তাঁরা দেশের সমৃদ্ধি বলে মনে করেছিলেন আর সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে এমন এক ব্যবস্থার সম্প্রসার চে‌ছিলেন যে ব্যবস্থায় তাঁরা স্বয়ং সমৃদ্ধ হয়েছেন।

তাঁদের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী ও তার মূল সম্বন্ধে অনুমানের আশ্রয় নেবার প্রয়োজন নেই। বঙ্গদূত নামে যে সাপ্তাহিক রামমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে ১৮২৯-এর মে মাসে প্রকাশিত হয় তার-ই ১৩ জুন ১৮২৯ সংখ্যায় 'গৌড়দেশের শ্রীবৃদ্ধি' শীর্ষক আলোচনায় দেখতে পাই: "গত কএক বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় ও গৌড়রাজ্যের সর্বত্র অনেক ধনবৃদ্ধি হইয়াছে ইহার কোন সন্দেহ নাই অতএব কি কারণে বৃদ্ধি হয় তাহার অনুসন্ধান করা আমারদিগের সুতরাং আবশ্যক ……ইহার কারণ এই যে [১] পূর্ব্বাপেক্ষা ভূম্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, দ্বিতীয়ত এদেশে অবাধে ব্যবসায় চলিতেছে বিশেষত অনেক য়োরোপীয় মহাশয়রদিগের সমাগম হইয়াছে ১২……"

অতঃপর ধনবৃদ্ধির স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এবং ধনবৃদ্ধির ফলে 'মধ্যবিত্ত শ্রেণীর' (যা তাঁদের আলোচনা থেকে দেশীয় বণিক শ্রেণীর সঙ্গে সমার্থক বলে মনে হয়) উদ্ভবের ফলে যে সব সামাজিক সুফল ঘটতে পারে, সে বিষয়েও তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপিত

১২। ১৮১৩ পর একমাত্র চৈনিক বাণিজ্য [china trade] ব্যতীত বাণিজ্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আইন বলে রদ হয়। বঙ্গদূতের আলোচক তার-ই সুফল আলোচনা করেছিলেন।

করা হয়েছে। ধনবৃদ্ধির স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁদের বক্তব্য থেকে মনে হয় যে, দেশে বিনিময়-ব্যবস্থার প্রসার ও টাকার অধিকতর প্রচলনকে তাঁরা বণিক হিসেবে ধনবৃদ্ধির সংগে সমার্থক বলে মনে করেছেন। তাঁদের বক্তব্য ঃ "ত্রিশবসর পূর্ব্বে যে সকল ভূমি ১৫ পোনের টাকা মূল্যে ক্রীতা হইয়াছিল এক্ষণে ৩০০ তিনশত টাকা পর্য্যন্ত তাহার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে ....এক্ষণে এই কলিকাতা নগরে কৌড়ির ব্যবহার প্রায় রহিত হইয়াছে এবং কিযৎকাল পরে তাহা সমুদায় লোপ পাইবেক, দশবৎসর পূর্ব্বে এ নগরে যে ব্যক্তি মাসে দুই তঙ্কা বেতন পাইত সে এক্ষণে চারি পাঁচ তঙ্কা পাওয়াতেও তুষ্ট নহে এবং ইহাতেও ঐ সকল লোকের অপ্রাপ্তি পূর্ব্বে যে সূত্রধর ৮ তঙ্কা বেতনে কর্ম্ম করিত সে এক্ষণে ১৬ তঙ্কা ঊর্দ্ধে ২০ তঙ্কা পর্য্যন্ত মাসিক পায়, শ্রমেরও মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ব্বে এক তঙ্কায় ১২ জন কৃষক লোক সমস্ত দিন শ্রম করিত এক্ষণে ৪ জন অধিক এক তঙ্কায় পাওয়া যায় না, পূর্ব্বে শালিভূমি এক বিঘার রাজস্ব এক তঙ্কা ছিল এক্ষণে ভূমাধিকারিরা সেই ভূমি তিন চারি তঙ্কা রাজস্ব চাহেন এবং যে তণ্ডুলের মোন ।।০ আট আনায় বিক্রয় হইত তাহার মূল্য এক্ষণে গড়ে দুই তঙ্কা হইয়াছে।"

ধনবৃদ্ধির যে খতিয়ান তাঁরা দিয়েছেন তা থেকেও অবশ্য দেশের লোকের প্রকৃত আয় (Real income) বৃদ্ধির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। মজুরীর হার যেখানে দ্বিগুণ থেকে চতুর্গুণ বেড়েছে সেখানে খাজনার হার কৃষিতে বেড়েছে তিন থেকে চারগুণ এবং শহরে জমির দর বিশগুণ! চালের দর বেড়েছে গড়ে চতুর্গুণ। সুতরাং ধন অর্থে যদি টাকার পরিমাণ সূচিত হয় যা বণিকদের বা আদিম বাণিজ্যবাদীদের (mercantilist) মৌলিক ধারণা—কেবল সে ক্ষেত্রেই ধনবৃদ্ধি হয়েছে এ-কথা বলা চলে। রামমোহন ও দ্বারকানাথ এ ধারণার বশবর্ত্তী হয়েছিলেন কারণ সম্ভবত তাঁরা স্বয়ং বণিক ছিলেন। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতির ভাঙনের সংগে সংগে আগে যে সব জিনিসের কেনা-বেচা হত না তার ক্রয়-বিক্রয় শুরু হয়। যার লেনদেন হত এমন পণ্যেরও পূর্বের চেয়ে বেশী পরিমাণে ক্রয়-বিক্রয় হতে থাকে। ফলে টাকার ব্যবহার

বেড়ে যায়। এর সঙ্গে সম্পদবৃদ্ধির কোন-ই যোগ নেই। যদি এই সংগে বিভিন্ন বৃত্তির সম্প্রসারণ ঘটে এবং নতুন বৃত্তির উদ্ভব হয় (যার অন্য নাম শিল্প-বিপ্লব) তা হলে এবং কেবলমাত্র তাহলে-ই ধনবৃদ্ধি ঘটে। তা না হলে যাঁরা স্বয়ং উৎপাদক না হলেও সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য যাঁদের মারফৎ বিনিময় হয় সেই বণিক শ্রেণীই লাভবান হন শুধু। সুতরাং এক্ষেত্রে এ সিদ্ধান্ত কোনাক্রমে-ই এড়ানো চলে না যে, নবযুগের চিন্তানায়কেরা তাঁদের স্ব-শ্রেণীর সমৃদ্ধিকে-ই দেশের সমৃদ্ধি বলে মনে করেছিলেন। এই সমৃদ্ধির কারণ তাঁদের মতানুযায়ী "·········অবাধে বাণিজ্য বিস্তার ও ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরদিগের সমাগম"·········সুতরাং······"পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন যে কালোনিজেশ্যন অর্থাৎ এদেশে য়োরোপীয় লোকের চাসবাসে এতদ্দেশীয় লোকের যে অসম্মতির জনরব হইয়াছে সে কুরব নীরবকরণে উদযুক্ত হউন······"।

অবশ্য রামমোহন ও দ্বারকানাথ যা আশা করেছিলেন তা যদি প্রকৃত-ই সম্ভব হত, তাহলে তাঁদের আশা, 'স্বাধীনতাও অদূরে সেই শ্রেণী প্রাপ্ত হইবেক', তা সফল হত কি না এটি একটি মূঢ় প্রশ্ন। কিন্তু স্বপ্নলব্ধ ইতিহাস সম্বন্ধে স্বাভাবিক অনাগ্রহ ছাড়াও যা সহজে-ই ধরা পড়ে তা এই যে, এঁরা হৃদয়ঙ্গম করেন নি যে, য়োরোপীয় মহাশয়েরা য়োরোপীয় মহাশয়দের স্বার্থেই এদেশে এসেছেন। অন্য কারণে নয়। মীরকাশিমের পরিণাম তাঁদের চেতনায় প্রতিফলিত হয়নি। হয়নি, কারণ য়োরোপীয় মহাশয়দের সংগে তাঁরা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। বাস্তব ইতিহাসের গতি অবশ্য তাঁদের সুখস্বপ্নকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। তাই দেখি যে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ সম্পূর্ণ হবার পূর্বেই প্রাক্তন সমৃদ্ধ বণিকদের যাঁরা বংশধর তাঁদের অনেকেই বাণিজ্য থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ছত্রচ্ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছেন। বাঙ্গালী সমাজের আর্থিক জীবনের এই পরিবর্তন যে পরিবারের ইতিহাসে বিশেষ উজ্জ্বল, তা হল স্বয়ং দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরিবার।

রামমোহন যখন কোলকাতায় একেশ্বরবাদ, সতীদাহ নিরোধ, সমাজ-

সংস্কার, ইয়োরোপীয় শিক্ষাবিস্তার ও গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ প্রণয়নে ব্যস্ত, সেই কালে গ্রাম-বাংলার দুইদিকে দুই শিশুর জন্ম হয় যাঁরা উত্তর-কালে রামমোহনসূচিত নবযুগের প্রেরণাকে নতুন পথে প্রসারিত করেন; তার ক্ষেত্র বিস্তৃত ও প্রবাহ গভীরতর করেন। আমি অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬) ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-৯১) কথা বলছি।

বাংলার নবযুগের যে পরিণতির কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি আমার বিবেচনায় সেই পরিণতি উপরোক্ত দুই ব্যক্তির চিন্তায় রূপ পরিগ্রহ করে, এবং যে সংকটের বিষয় উল্লেখ করেছি উভয়েই শেষ বয়সে তার শিকার হন বলে মনে হয়। অক্ষয় দত্ত ব্রাহ্ম সমাজের সংস্রব ত্যাগ করে কোলকাতার উপকণ্ঠে বালিগ্রামে (বর্তমানে গ্রাম নয়) বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করেন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙ্গালী সমাজের সংস্রব ত্যাগ করে কর্মাটারে একক জীবন বেছে নেন।

অক্ষয় দত্তের চিন্তা ও রচনায় রামমোহন কথিত "যুক্তির বিচার" এবং তার-ই পরিণতি হিসেবে যুক্তির নিরিখে শাস্ত্রের বিচার চোখে পড়ে এবং বিদ্যাসাগরের রচনা ও কার্যে রামমোহন কথিত "প্রত্যক্ষ সিদ্ধ" সামাজিক সত্যের উন্মোচন, এবং তার-ই ভিত্তিতে দেশাচারের বিরুদ্ধে ঐতিহ্য-সন্ধানী "শাস্ত্রের বিচার" দেখতে পাই। তাই উভয়ে-ই যখন শেষকালে নিরীশ্বর-বাদের প্রান্তরে এসে দাঁড়ালেন তখন একের প্রেরণা ছিল নিউটনের পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তিতে গঠিত নিয়মনিবদ্ধ বিশ্বদৃষ্টি; অপরের মানসে ছিল ১৮৬৬ খৃঃ-তে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে দেশের মানুষের দুর্দশাগ্রস্ত রূপ।

১৮৫০-৬০, এই দশকে-ই নবগের পরিণতি। তত্ত্ববোধিনী ১৭৭১ শক ফাল্গুনে (১৮৫০ ফেব্রুয়ারী-মার্চ) অক্ষয় দত্ত ঘোষণা করেন, "যে পরম ধর্ম সমুদায় মনুষ্যের মানসপটে ও সকল বাহ্য পদার্থের সর্ব্বস্থানে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, এই বিশ্বরূপ অভ্রান্ত গ্রন্থই যে ধর্মের সাক্ষী··· যাহার প্রামাণ্য বিষয়ে লেশমাত্রও সংশয় নাই···এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান নিখিল ব্রহ্মাণ্ড রূপ সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ মাত্র···পরমেশ্বর প্রণীত শাস্ত্র স্বরূপ···"

অতএব কর্তব্য কি ?

"তদীয় আলোচনা ও তন্মূলক গ্রন্থানুশীলন"। অর্থাৎ বিজ্ঞান-ই নবযুগের ধর্ম। তদ্ব্যতীত অন্য শাস্ত্র ইত্যাদি কল্পনামাত্র কারণ, "পরম কারুণিক পরমেশ্বর এই যে অখিল বিশ্বরূপ সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ দ্বারা আপনার অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ ও আমাদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন তাহাই আমাদিগের ব্রাহ্মদিগের মূল..."

কার্যক্ষেত্রে অক্ষয় দত্তের বৈজ্ঞানিক চিন্তার সর্বাপেক্ষা বড় কীর্তি ব্রাহ্মসমাজকে 'বেদ শৃঙ্খল' থেকে মুক্তি দান। "ধর্মের মূল ভূমি কোন পুস্তক হইতে পারে না" এই ধারণা ঘোষণা করার স্বীকার সংগে সংগে আপ্তবাক্যের সিংহাসনচ্যুতি ও ধর্মশাস্ত্রের অভ্রান্ততা বা অপৌরুষেয়তার অন্ত ঘোষিত হয়। পরিণত অক্ষয় দত্তের মত তাঁর 'ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়'-এর প্রথম ভাগের (১৮৭০) ভূমিকায় স্পষ্টত বিবৃত হয়েছে। বিভিন্ন ধর্ম-সাম্প্রদায়িক মতগুলিকে 'ভ্রান্তিভূধব' আখ্যা দিয়ে তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'বেকন, বেকন ভারতবর্ষে একটি বেকনের প্রয়োজন হইয়াছিল।'

একই কালে "প্রত্যক্ষ সিদ্ধ" সামাজিক জ্ঞানের বলে ও মানবিকতার প্রেরণায় বিদ্যাসাগর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, "তোমরা মনে কর, পতি বিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়, দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না ; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না, দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ...হায় কি পরিতাপের বিষয়...দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই ১৩"।

চিন্তার ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগর অক্ষয় দত্তের মত-ই রামমোহনের সফল উত্তরাধিকারী ছিলেন। ১৮৫৩-র ৭ই সেপ্টেম্বর তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে শিক্ষা-বিভাগীয় সেক্রেটারী F. I. Mouat কে যে

১৩। বিধবাবিবাহ ২য় পুস্তক অক্টোবর ১৮৫৫, দ্রষ্টব্য : বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী-সমাজ, পৃঃ ১৮৬-৮৭, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ।

পত্র দেন তা ১৮২৩-এর এপ্রিলে লর্ড আমহার্স্টকে লিখিত রামমোহনের পত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়। রামমোহন দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার চেয়েছিলেন; বেদান্ত দর্শনকে ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর বলে উল্লেখ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরও দ্বিধাহীন ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন: That the Vedanta and Sankhya are false systems of Philosophy is no longer a matter of dispute…It is not possible in all cases I fear that we shall be able to shew real agreement between European Science and Hindu Shastras." নবযুগের এই ত্রয়ী, জ্ঞানের রাজ্যে ও জীবনে সত্যের প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন; গোষ্ঠিগত সংস্কারের জয় কামনা করেন নি। ঐ এক-ই চিঠিতে বিদ্যাসাগর বলেন, 'যে যথার্থরূপে ধারণা করিয়াছে তাহার কাছে সত্য—সত্যই, সত্য দুই রকমের এই ভাব অসম্পূর্ণ ধারণার ফল ১৪।'

১৮৫৬-১৬ জুলাই, বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত আইন চালু হয়। প্রায় ঐ সময়ে (১৮৫৫, ২৭ ডিসেম্বর) তিনি বহুবিবাহ রহিত করণের উদ্দেশ্যে সরকারের কাছে প্রথম আবেদনপত্র পেশ করেন। পরে এ বিষয়ে তিনি যাঁদের কাছে বাধাপ্রাপ্ত হন, তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৮৫০-৬০, বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে যুগ-সন্ধির কাল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে উত্তর ও মধ্য ভারতের ব্যাপক ব্রিটিশ-বিরোধী অভ্যুত্থানের পর ভারত সরাসরি সাম্রাজ্য-শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। এবং মহারাণীর ঘোষণায় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমবিচারও সমব্যবহারের প্রতিশ্রুতি সাড়ম্বরে উচ্চারিত হল বলে-ই বোধহয়, সাম্রাজ্যবাদের নিজস্ব নিয়মে তারপর জাতি-বৈষম্যের সমস্যা উগ্র ও ব্যাপক হয়ে পড়ল। এতকাল যে ইংরেজি-শিক্ষিতশ্রেণী ইংরেজের সদিচ্ছায় কোন অনাস্থা পোষণ করেন নি, বরং তাঁদের সংস্কার আন্দোলনে ইংরেজকে মিত্ররূপে ধারণা করেছেন,

১৪। দ্রষ্টব্য: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়-এর *Ishwar Chandra Vidyasagar as an educationist* মডার্ন রিভিয়ু অক্টোবর ১৯২৭।

অকস্মাৎ তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে, ইংরেজের ধারণায় তাঁরা মনুষ্যপদবাচ্য-ই নন। তাঁরা জন্মসূত্রে হীন ; হীনতা-ই তাঁদের বিধিলিপি। এদেশের আবহাওয়া, দেশীয়দের শারীরিক গঠন, সামাজিক বিন্যাস, সব কিছুর কারণে স্বতন্ত্রভাবে এবং সকলের সমবায়ে তাঁদের এই হীনতা পুরুষানুক্রমিক এবং অবশ্যম্ভাবী। (বাকলের মতামত সম্পর্কে 'বঙ্গদেশের কৃষকে' বঙ্কিমের কাতর আলোচনা দ্রষ্টব্য)। সাম্রাজ্যবাদ ঈশ্বরের বিধান এবং চিরকাল থাকবে, কারণ ভারতীয়রা জাতি হিসাবে আত্মশাসনে অপারগ, আত্মরক্ষায় অসমর্থ। এ হীনতা যাবার নয়, বাইরের কোন কারণবশতও নয়, ভারতীয়দের ভারতীয়ত্ব বশত-ই ; কাজেই সাম্রাজ্যদের প্রয়োজনও চিরস্থায়ী। বস্তুত সাম্রাজ্যবিস্তারের যুগে যে ইংরেজী-শিক্ষিত শ্রেণীকে মিত্ররূপে গণ্য করার কারণ ইংরেজের ছিল, সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় হবার পর তাদের দাস ছাড়া অন্য কোনরূপে গণ্য করার কোন কারণ তাদের রইল না। তাই এই মত পরিবর্তন। অথচ সেই দাস যদি অধিকার সচেতন হয়ে পড়ে, প্রশ্ন করে, তাহলে দাসত্ব-ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা অনিবার্য। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী তাদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার কারণেই অচেতন থাকতে পারে নি। তাই সংঘর্ষ অনিবার্য হয়।

১৮৫৭-র পর থেকেই যে সাম্রাজ্যবাদের এই ভাবান্তর, তার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি হয়ত প্রামাণ্য বিবেচিত হতে পারে, "······১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধে কোম্পানী বাহাদুরের প্রাণ ধ্বংস হয়। আর যে দিবস কোম্পানি বাহাদুরের লয় হয়, সেই দিবস হইতে আর একটি বৃহত্তর সমরের সূত্রপাত হয়।

······কোম্পানি বাহাদুরের ধ্বংস হইল, মহারাণীর স্বীয় হস্তে ভারতের ভাগ্য ন্যস্ত হইল। বাঙ্গালীর শুষ্ক হৃদয়ে তখন বারি সঞ্চারিত হইল। নিরাশ বাঙ্গালীর আশার অঙ্কুর হইল আর মহারাণীর সুশাসনে এই অঙ্কুর ক্রমে সম্বর্দ্ধন হইতেছে এই আশা ইংরাজদিগের স্বেচ্ছাচারিতায় পদে পদে বাধা জন্মাইতেছে। আধা ডিক্রি, ডিসমিসের সময় আর নাই, অনেক কাল গিয়াছে।

সূক্ষ্মদর্শী দেখিবেন যে, ইংরাজ ও বাঙ্গালীতে এই বিবাদ ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। ইংরাজের ইচ্ছা বাঙ্গালীকে পদানত রাখা, বাঙ্গালীর ইচ্ছা উঠিয়া দাঁড়ান।······পরমেশ্বর আমাদের দিকে। তিনি দুর্বলের দিকে থাকেন, তিনি উপায়হীন দাসের দিকে থাকেন, আর তাঁহার নিকট ইংরাজ হিন্দু সাদা কালো খ্রীষ্টীয়ান পৌত্তলিক সব সমান (আমাদের লাইবেল মোকদ্দমা ঃ অমৃতবাজার পত্রিকা ৩১শে ডিসেম্বর ১৮৬৮)।

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকেই সেই কালের সংকট সুস্পষ্ট হবে। ১৮৫৭-র পর ইংরেজকে মিত্ররূপে ধারণা করার আর কোন অবকাশ নেই। ইংরেজ আমাদের উন্নতিকল্পে এদেশে আসেনি, ইংরেজ শাসন আমাদের উন্নতির পথে বাধা-স্বরূপ। 'খ্রীষ্টীয়ান পৌত্তলিকের' পার্থক্যও আর গুরুত্বপূর্ণ নয়। জাতীয় স্বার্থরক্ষা ও জাতীয়-উন্নতির বিধান-ই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই সময়ে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (মৃত্যু, ১৮৬১) কর্তৃক সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা মধ্য-বঙ্গে কৃষকদের উপর বিদেশী নীলকরদের অত্যাচার কাহিনী তুলে ধরে, শিক্ষিত সমাজকে সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত চরিত্র সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। কৃষক-সমাজের স্বার্থের সঙ্গে মধ্যশ্রেণীর চেতনা সেই প্রথম অঙ্গীকৃত হয়। প্রকাশিত হয় দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩) নীলদর্পণ (১৮৬০)। এই কালেই মাইকেলের প্রতিভা সাহিত্যে (এবং জীবনেও) অনমনীয় বিদ্রোহী চরিত্র ও আদর্শের সৃষ্টি করে শিক্ষিত মানুষের আত্মশক্তিকে দৃঢ় ও উদ্দীপ্ত করে। ফলে এই যুগে ব্যাপকভাবে জাতীয়তার প্রশ্ন, জাতীয় চরিত্র ও জাতীয় উন্নতির প্রশ্ন দেখা দেয় এবং তার ভিত্তি হিসেবে জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের ধারণা দানা বাঁধে। জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের বিচার থেকে-ই আসে জাতি ও জাতীয়তা নির্ণয়ের চেষ্টা এবং তার থেকে জাতি তথা সমাজের বর্তমান অবনতি কি কারণে ঘটল সেই ঐতিহাসিক বিচারের সূত্রপাত। এর-ই ফলে এল অতীত-চেতনতা, অতীত-মুখীনতা। বর্তমানে হেয় হলেও জাতি যে চিরকাল হেয় ছিল না, সাম্রাজ্যবাদের অবিনশ্বরতা অপ্রমাণ করার জন্য সে কথা প্রমাণ করার প্রয়োজন ছিল। এবং এই সমস্ত প্রশ্ন যাঁকে বিশেষভাবে আলোড়িত করে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়। যুগের সমস্যা তাঁকে বিশেষভাবে বিচলিত করেছিল। আজীবন তিনি তাঁর স্বীয় ভিত্তি থেকে তার ব্যাখ্যা ও সমাধানের চেষ্টা করেন। কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তৃততর বিচারে অবতীর্ণ হবার পূর্বে নবযুগের অপর যে ধারা—সমাজ-সংস্কার আন্দোলন, তার নেতৃবর্গ জাতীয়তার উদ্ভবে কি সমস্যার সম্মুখীন হলেন ও কি ভাবে তার সমাধান করতে অগ্রসর হলেন, সে বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

ভারতীয় হিন্দু সমাজের উপর নিরন্তর বিদ্রূপ, তাচ্ছিল্য ও ধ্বংসাত্মক সমালোচনা বর্ষিত হবার ফলে জাতীয়তাবাদীদের মনে, যাঁরা হিন্দু সমাজের দুর্বলতাকে প্রকাশ্যে স্বীকার করেন, তাঁরা ইংরেজের দলভুক্ত এই বোধ গড়ে উঠল। এবং সে ধারণাকে দৃঢ় করার কারণ যোগালেন সংস্কারবাদীরা স্বয়ং। সমগ্রভাবে সমাজ-বিচ্ছিন্ন হবার ফলে-ই সম্ভবত দেশের অভ্যন্তরে পরিবর্তন ও সংস্কারের যে প্রেরণা তা তাঁরা দেখতে পান নি বা চান নি। ইংরেজের মহিমায় সামাজিক উন্নতি সম্ভব হবে—রামমোহনের যুগের এই প্রাথমিক সংস্কার ত্যাগ না করে বরং অন্য সমস্ত কিছুর বিনিময়ে সেই ধারণা পুষ্ট করেছিলেন। ব্রিটিশ রাজত্ব ঈশ্বরের বিধান, পুনঃপুনঃ এই ঘোষণাও কেশবচন্দ্র প্রমুখ সংস্কারবাদীকে ক্রমে জাতীয়তাবাদীদের অপ্রিয় করে তুলেছিল এবং সংস্কারবাদকে জনপ্রিয় হতে দেয় নি। যুবকদের সমর্থন থেকে বঞ্চিত করেছিল ১৫। সংস্কারকদের ভাবদ্বন্দ্বের স্বরূপ স্পষ্ট হবে বিশেষত ধর্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-১৮৮৪) মতামত থেকে।

১৫। সিভিলম্যারেজ আইনের (১৮৭২) পর লোকের মনের উপরে ব্রাহ্ম-সমাজের শক্তি অল্পে অল্পে হ্রাস পাইতে লাগিল। কেশবচন্দ্র সেন আর পূর্ব্বের ন্যায় অবিসম্বাদিত নেতা রহিলেন না; এবং যুবকদলের তাঁহার দিকে আর সে প্রবল আকর্ষণ রহিল না।...১৮৭৪ সালে একদিকে আনন্দমোহন বসু বিলাত হইতে ফিরিলেন; অপরদিকে সেই সময়েই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়...কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া কলিকাতাতে আসিয়া বসিলেন, হাজার হাজার যুবক ইঁহাদের কথা শুনিবার জন্য ছুটিতে লাগিল, এবং হাজার হাজার হৃদয়ে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা ও স্বদেশানুরাগ প্রবল হইয়া উঠিল। যুবকদল যেন ব্রাহ্মসমাজের দিকে পিঠ ফিরিল এবং রাজনীতি ও জাতীয় উন্নতির দিকে মুখ ফিরিল।...আমার মনে হয় যুবক-দলের সে ভাব এখনও সম্পূর্ণ ঘুচে নাই (শিবনাথ শাস্ত্রী: রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ পৃঃ ৩০৭-৩০৮ ২য় সংস্করণ, ১৯০৯)।

১৮৫৯-এ কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন এবং আরম্ভে-ই নেতৃপদে বৃত হন।

১৮৬৬-তে তাঁর বিখ্যাত *Jesus Chirst: Europe and Asia* নামক বক্তৃতায় অন্যান্য কথার মধ্যে কেশবচন্দ্র বলেন ঃ—

It cannot be said that we in India have nothing to do with Christ or christianity. While, through missionary agency our country has been connected with the enlightened nations of the west, politically an all-wise and all-merciful providence has entrusted its interests to the hands of a christian sovereign. ……We stand in the wise arrangements of providence, europeans and natives bound together by identity of political interests and yielding common subjection to her gracious majesty, and certainly God requires of us that we should so adjust our mutual relations and fulfil our respective missions that we may benefit each other and harmoniously co-operate for the furtherance of our common objects.

এই *Common Objects* যে কি তা অবশ্য তিনি বলেন নি। এবং তারপর ইংরেজরা দেশীয়দের শৃগালসদৃশ জ্ঞান করে এবং দেশীয়রা যে ইংরেজদের নেকড়েতুল্য বিবেচনা করে, সে কথার উল্লেখ করে তিনি বলেন ঃ

There is some truth in these caricatures…… Selfishness is a characteristic of our nation and into this many of our national defects may resolve themselves. But this selfishness may be accounted for by the circumstances under which we live. We are a subject race,…we have too long been under

foreign sway to feel anything like independence in our hearts. Socially and religiously we are little better than slaves. From infancy up we have been trained to believe that we are hindus only so for as we offer slavish obedience to the authority of the *Shāstras* and the priests···Then again we are physically cribbed and confined. Travelling is religiously interdicted. A native lives and moves in his little house and knows no world beyond the boundaries of his own country. His notion of men and things must necessarily be narrow and contracted.

অতঃপর দেশীয় চরিত্রের কতকগুলি গুণ তিনি বলেন, যথা নম্রতা, শান্তিপ্রিয়তা, অক্রোধ ইত্যাদি এবং তারপর ভারতে ইংরেজ বা ইয়োরোপীয়দের চরিত্র ও ব্যবহার সম্বন্ধে বলেন :

The european nature is rough, stern, impulsive and fiery, it thinks meekness to be cowardice, it rejoices and glories in violence and vengeance. ······ How often do such qualities, overstepping all legitimate bounds, and defying all higher impulses become frightful sources of mischief ! And also how sadly manifest is this in India !

এখন এ-দ্বন্দ্বের সমাধান কি ? উভয়ের স্বার্থের বৈপরীত্য কি এর কারণ ? তার-ই দূরীকরণ প্রয়োজন কি ? কেশবচন্দ্রের মতে উভয় সম্প্রদায় যদি খৃষ্টীয় নীতিমার্গ অবলম্বন করে, তাহলে-ই জাতি-ঘটিত সব সমস্যার সমাধান হবে। কেশবচন্দ্র সেনের ভাষায় :

Christ tells us to forgive our enemies, yea, to bless them that curse us and pray for them that des-

pitefully use us···Often have I advised my native friends to forget and forgive the wrong inflicted upon them by cruel and insolent europeans, instead of seeking to gratify their anger,···

To the european community the doctrine of christian charity applies with greater force. As christians they ought to be baptized into christian meekness ; they will be thereby humanized and then proneness to indulge in violence and ferocity will be effectually curbed (*Life and works of Brahamananda keshav* compiled by *Dr. Premsundar Basu. Navabidhan Publication committee. 1940 pp. 96-106*)

যে দাস, যে নিরুপায়, অন্যায়ের প্রতিকার করার ক্ষমতা যার নেই, তার পক্ষে অত্যাচারীকে ক্ষমা করার কথা বলা, দুর্বলের আত্ম-ছলনা মাত্র। কেশবচন্দ্রের ভাবের বাণী তাই শেষ পর্যন্ত যুবকদের সমর্থন পায় নি।

কেশবচন্দ্র অবশ্য পরে সংস্কারবাদীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন কিন্তু গত শতকের সপ্তম দশকে তিনি এ দলের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। অন্তত ১৮৫৯ থেকে ১৮৭২ পর্যন্ত দেশের সর্বসাধারণের কাছে তিনি-ই নতুন ভাবের ভগীরথরূপে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর অবিচল সরকারভক্তি ও সাহেব-সচেতনতা নতুন ভাবাদর্শকে বহুলাংশে বিদেশী বলে চিহ্নিত করে। জাগরণমুখর জাতীয়তাবাদীরা, যাদের একাংশে পরবৎসর (১৮৬৭) ন্যাশনাল মেলা বা হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁরা কেশবের ব্যাখ্যা মেনে নিতে পারেন নি। হিন্দুসমাজের সমালোচনা, বিশেষত বিদেশীর কৃত সমালোচনাকে মেনে নেওয়া, তাঁদের চেতনায় জাতীয় অপমানের স্বীকৃতি বলে মনে হয়েছিল। ভালো হোক মন্দ হোক হিন্দুত্বকে সমর্থন জানালে, হিন্দুত্বের নিহিত গৌরব প্রতিপন্ন করতে পারলে, ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্যাভিমানকে প্রতিহত করা যাবে, এই বিশ্বাস তাঁদের মনে প্রবলাকার ধারণ করে। স্বয়ং

উচ্চবর্ণের ছিলেন বলে হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণীর জ্ঞানে জাতিভেদ প্রথার প্রত্যক্ষ পীড়নের বোধ সজীব ছিল না। প্রথমত মানসিক উদারতার প্রভাবে-ই তাঁরা সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হন—সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণে, আর্থিক বিপর্যয়ে ও তজ্জনিত নৈতিক চাপের ফলে সে উদারতা রক্ষা করা যায় নি। সাম্রাজ্যবাদের যে সব পৃষ্ঠপোষক বলেন যে, সাম্রাজ্যবাদের কল্যাণে এদেশে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ধারণা প্রসার লাভ করেছে, তাঁদের মনে করিয়ে দেওয়া কর্তব্য যে, সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্ট জাতিবিদ্বেষের পরিবেশ ও আদর্শ এবং অর্থনৈতিক পশ্চাৎপরতার ফলেই পাশ্চাত্য ধারণা ও আদর্শ গ্রহণ করা দেশীয় শিক্ষিতদের পক্ষে শেষ পর্যন্ত অসম্ভব হয়ে পড়ে।

বঙ্কিমের ধ্যানধারণার বিচারে অবতীর্ণ হবার পূর্ব্বে তাঁর কালগত এই পরিপ্রেক্ষিত স্মরণে রাখা কর্তব্য। যুক্তিবাদ তাঁর পূর্বে-ই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; জাতীয়তাবাদ তাঁর সমসাময়িক। জাতীয়তার সূত্রে জেগেছে জাতীয়সত্তা (National identity) সম্বন্ধে প্রশ্ন, জাতির ইতিহাস, অবনতির কারণ ও বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন এবং যেহেতু তৎকালে শিক্ষিত বাঙ্গালী প্রায় সর্বাংশে হিন্দু, তাই জাতি অর্থে স্বভাবত-ই দাঁড়িয়েছে হিন্দুজাতি।

বঙ্কিমচন্দ্র | রাজনীতি ও সমাজ

সমালোচকদের মতানুসারে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত সাহিত্য-জীবন মোটামুটি তিনটি মূল ভাগে বিভক্ত। প্রথম তাঁর রোমান্স বা কল্পনা-কাহিনী রচনার যুগ। ১৮৬৫-তে দুর্গেশনন্দিনীর প্রকাশ থেকে বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রকাশ, ১৮৭২ পর্য্যন্ত এই প্রথম যুগের স্থিতি। দ্বিতীয় যুগ বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রকাশ কাল (১৮৭২ এপ্রিল) থেকে কৃষ্ণকান্তের উইলের প্রকাশ-কাল ১৮৭৮, অথবা আনন্দমঠ রচনার (১৮৮০-৮২) প্রাক্কাল পর্য্যন্ত ধরা যায়। এবং তৃতীয় যুগের বিস্তৃতি আনন্দমঠ উপন্যাসের রচনাকাল থেকে তাঁর মৃত্যু (১৮৯৪) পর্য্যন্ত।

তাঁর রচনার দ্বিতীয় যুগ যেমন বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল প্রভৃতি বিখ্যাত সামাজিক উপন্যাসগুলির রচনাকাল, অপরপক্ষে—লোকরহস্য, বিজ্ঞান রহস্য, সাম্য, বঙ্গদেশের কৃষক, কমলাকান্তের দপ্তর এবং সাহিত্যতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতি "বিবিধ প্রবন্ধে" সংকলিত নানা বিষয়ক প্রবন্ধগুলিও এই এক-ই কালে রচিত। এর অধিকাংশ-ই তাঁর স্ব-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকায় (১৮৭২ এপ্রিল—১৮৭৬ মার্চ) প্রথম প্রকাশিত হয়।

তৃতীয় যুগে রচিত হয়েছে তাঁর নৈতিক ও রাজনৈতিক উপন্যাসত্রয় —আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪), সীতারাম (১৮৮৭) এবং চিন্তামূলক রচনার মধ্যে কৃষ্ণচরিত্র (১৮৮৬), ধর্ম্মতত্ত্ব (১৮৮৮)। 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম' নামে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটিও এই এক-ই কালে রচিত, যদিও তাঁর জীবিতকালে এই গ্রন্থের প্রকাশ ঘটেনি। এই সময়ে তিনি ভগবদগীতার উপরও বিস্তৃত আলোচনা করেন। সাময়িক পত্রিকার ক্ষেত্রে বঙ্গদর্শন (১৮৭২) যেমন তাঁর দ্বিতীয় যুগের মৌলকীর্ত্তি, তৃতীয় যুগের সৃষ্টি হল প্রচার পত্রিকা (শ্রাবণ ১২৯১ বা ১৮৮৪ জুলাই-আগস্ট)।

উপরোক্ত বিবরণ থেকে এটুকু স্পষ্ট যে সাহিত্যিক জীবনের প্রথম অংশে বঙ্গদর্শন প্রকাশের পূর্বে চিন্তানায়ক বঙ্কিমের সাক্ষাৎ সাহিত্যে পাওয়া যায় না। সুতরাং বলা যায় যে, চিন্তানায়ক বঙ্কিমের উদয় বাংলাদেশে স্বাজাত্যাভিমানের উদয়ের ঈষৎ পরবর্ত্তী। বঙ্কিমের বিশ্বদৃষ্টি কি ছিল তার বিবরণ ও বিচারণে প্রবৃত্ত হলে তাই সর্বাগ্রে দ্বিতীয় যুগের বঙ্কিমের সামগ্রিক চিন্তাধারার পরিচয় দান কর্তব্য হয়ে পড়ে।

সূচনা থেকেই বঙ্কিম জাতীয়তার সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। ইয়োরোপীয় এবং এদেশীয়দের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, তার মূল যে বাস্তব অবস্থার মধ্যে নিহিত এবং সেই অবস্থার দূরীকরণ ব্যতীত কোন ভাবমার্গে উত্তরণ করলে যে সে সমস্যার সমাধান হবেনা, এ বিষয়ে তাঁর কোন দ্বিধা ছিল না। সেই সময়েই 'আমরা' বলতে তিনি কি মনে করেন, এবং জাতীয় অস্তিত্বের মূল কি, এ বিষয়ে তাঁর ধারণারও পরিচয় পাওয়া

যায়। বঙ্কিমের ভাষাতে "...ইংরেজরা জেতা, আমরা বিজিত। মনুষ্য স্বভাবই এমত নহে যে বিজিত হইয়া জেতার প্রতি ভক্তিমান হয় অথবা তাহাদিগকে হিতাভিলাষী নিস্পৃহ মনে করে।...আজ্ঞাকারী আমরা বটে কিন্তু বিনীত নহি, হইতে পারিব না। কেন না আমরা প্রাচীন জাতি। অদ্যাপি মহাভারত রামায়ণ পড়ি, মনু যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যবস্থা অনুসারে চলি, স্নান করিয়া জগতে অতুল্য সংস্কৃত ভাষায় ঈশ্বর আরাধনা করি। যতদিন এ সকল বিস্মৃত হইতে না পারি ততদিন বিনীত হইতে পারিব না[১৬]।

অর্থাৎ আমাদের হিন্দুত্ব ও ঐতিহ্যগৌরব-ই আমাদের জাতীয়তার মূল। আমরা "প্রাচীন জাতি" তাই বর্তমানে হীনাবস্থায় পতিত হলেও ইংরেজের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান স্বীকার করে নেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য পরে একাধিকবার প্রমাণ করেছেন যে, আমরা মনু যাজ্ঞবল্ক্যের বিধান অনুসারে চলি না, এবং তা চলা সম্ভব এমন কি সঙ্গতও নয়। কিন্তু জাতীয়তার ভিত্তি হিসাবে প্রথমাবধি তিনি দেশগত ভিত্তির চেয়ে ধর্ম ও সামাজিক ভিত্তির উপরে-ই নির্ভর করছিলেন। সম্ভবত এই কারণে-ই হিন্দুত্বের ধারণাকে পুষ্ট করার জন্য পরবর্তীকালে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। জাতীয়তা এবং হিন্দুত্বের ধারণা সম্পূর্ণ সমার্থক কিনা এ বিষয়ে বঙ্কিমের মনে অবশ্য-ই প্রশ্ন ছিল এবং এই কারণে-ই পরবর্তীকালে উভয়ের আদর্শ যে সমার্থক এই প্রমাণ প্রতিষ্ঠা-কল্পে তিনি নিজের সমস্ত চিন্তাকে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর উদ্যম কতটা সার্থক হয়েছে তা বিশেষ করে আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও ধর্ম্মতত্ত্ব-এর আলোচনায় প্রকাশ পাবে।

কিন্তু জাতীয়তার কারণ ও প্রয়োজন সম্বন্ধে বঙ্কিমের মতামতও উল্লেখযোগ্য। তিনি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত ও বাস্তব অবস্থা-সচেতন ছিলেন। ঐ এক-ই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন ঃ

"......এই জাতিবৈর আমাদের প্রকৃত অবস্থার ফল......যতদিন দেশী বিদেশীর বিজিত-জেতৃ-সম্বন্ধ থাকিবে, যতদিন আমরা নিকৃষ্ট হইয়াও পূর্ব গৌরব মনে রাখিব, ততদিন জাতিবৈরের সমতার সম্ভাবনা নাই, এবং

আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, যতদিন ইংরেজের সমতুল্য না হই ততদিন যেন আমাদিগের মধ্যে এই জাতিবোধের প্রভাব এমনই প্রবল থাকে। যদি……জাতিবৈরতার উপশম ঘটে তাহা হইলে নিকৃষ্ট জাতি (অর্থাৎ বাঙ্গালী) উৎকৃষ্টের নিকট বিনীত আজ্ঞাকারী এবং ভক্তিমান হইবে……এইরূপ মানসিক অবস্থা উন্নতির পথরোধক। যখন বাঙ্গালী ইংরেজের তুল্য না হইয়াও ইংরেজের প্রতি জাতিবৈরশূন্য হইবে .তখন বাঙ্গালী আত্মোন্নতির সম্ভাবনায় বিশ্বাস করিবে না, তাহার চেষ্টাও করিবে না……তখন ভাবী উন্নতির মূল এককালীন উৎপাটিত হইবে ১৭।"

কেশবচন্দ্র সেনের দ্বার্থভাষণের তুলনায় এই দৃষ্টিভঙ্গী অনেক স্পষ্ট। এই স্পষ্টতার মূল অনুসন্ধানের জন্য সম্ভবত দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপের প্রয়োজন নেই। বঙ্কিমের বাস্তব জীবনগত অভিজ্ঞতা-ই তার ভিত্তি। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট বঙ্কিম—'লেখাপড়া করে যে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে'-র যুগে স্বত-ই অনায়াসে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। মধ্যবিত্ত সন্তানের অভিকাম্য এই পদ এবং এই পদের পেষনে, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় অন্যান্য মধ্যবিত্ত সন্তানের মত তাঁরও ইংরেজের সদাশয়তা ও ন্যায়পরায়ণতায় বিশ্বাস বিলুপ্ত হয়। তাঁব আত্মীয়-বন্ধু ইত্যাদি স্বজাতীয় সমশ্রেণীর দুর্গতিও চেতনায় জীবন্ত ছিল তাঁর। উপলিদ্ধৃত প্রবন্ধ রচনার তিন বৎসর পর ১৮৭৬-এ দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী ও চরিত সমালোচনা প্রসংগে বঙ্কিমের উপলব্ধি এই ঃ

"দীনবন্ধুর যেরূপ কার্যদক্ষতা এবং বহুদর্শিতা ছিল, তাহাতে তিনি যদি বাঙ্গালী না হইতেন, তাহা হইলে মৃত্যুর অনেকদিন পূর্ব্বেই তিনি পোস্ট মাষ্টার জেনেরেল হইতেন এবং কালে ডাইরেক্টর জেনেরেল হইতে পারিতেন। কিন্তু যেমন শতবার ধৌত করিলে অঙ্গারের মালিন্য যায় না তেমনি কাহারও কাহারও কাছে সহস্র গুণ থাকিলেও কৃষ্ণবর্ণের দোষ যায় না। Charity যেমন সহস্র দোষ ঢাকিয়া রাখে কৃষ্ণ চর্ম তেমনি সহস্র গুণ ঢাকিয়া রাখে।"

শিক্ষিতদের প্রতি সাম্রাজ্যবাদের ব্যবহারের স্বরূপ-এর চেয়ে স্পষ্ট করে কোথাও উদ্ঘাটিত হয় নি।

জাতীয়তার সমস্যার সম্মুখীন হবার সংগে সংগে বঙ্কিম জাতি কি এই প্রশ্নেরও সম্মুখীন হন। জাতির দুর্গতির কারণ ও উন্নতির পথ নির্ণয় করতে গিয়ে সমাজব্যবস্থার উন্নতি ও অবনতির সাধারণ সূত্র নির্ধারণে আত্মনিয়োগ করেন। যদি সমাজতত্ত্বের সাধারণ সূত্রগুলির কথা বিবেচনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, বঙ্গদেশের কৃষক ও সাম্যে তিনি যা যা নির্দেশ করেন ধর্ম্মতত্ত্বে তার বিপরীত মত জ্ঞাপন করেন। বঙ্কিমের চেতনায় জাতি বলতে কি প্রতিভাত হত এটি একটি প্রধান প্রশ্ন, কারণ তাঁর সামগ্রিক রচনা থেকে যে জাতীয়তাবাদের ধারণার সৃষ্টি হয় তাকে সংগত ভাবেই হিন্দু জাতীয়তাবাদ বলা হয়ে থাকে। এবং হিন্দু, বাস্তবে বাঙ্গালী হিন্দু। 'আমরা প্রাচীন জাতি' বলতে মনু যাজ্ঞবল্ক্যের বিধানে চলা যে জাতিকে তিনি নির্দেশ করেছিলেন তাঁরা যে সর্বশ্রেণীর ভারতীয় তাঁর রচনা থেকে তা সর্বত্র সমান স্পষ্ট নয়। এবং একথাও বলা যায় না যে হিন্দুত্ব ও ভারতীয়ত্ব যে সমার্থক নয় এ-বিষয়ে বঙ্কিম সম্পূর্ণ অচেতন ছিলেন। তৃতীয় যুগের পরিণত অবস্থায়, ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্বের আলোচনা প্রসংগে (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) তিনি উল্লেখ করেন, "দেশবাৎসল্য পরম ধর্ম কিন্তু এ ধর্ম অনেক দিন হইতে বাংলা দেশে ছিল না। কখনও ছিল কিনা বলিতে পারি না। তখনকার লোকে আপন আপন সমাজ আপন আপন জাতি বা আপন আপন ধর্মকে ভালবাসিত, ইহা দেশবাৎসল্যের ন্যায় উদার নহে—অনেক নিকৃষ্ট।"

এবং ভারতবর্ষের বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়তার সমস্যা যে কি পরিমাণ জটিল তাও তাঁর ধারণাতীত ছিল না। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদর্শনে 'ভারতকলঙ্ক : ভারত পরাধীন কেন' প্রবন্ধে তাঁর উক্তি প্রাসঙ্গিক জ্ঞানে উদ্ধৃত করি : "এই ভারতবর্ষে নানা জাতি। বাসস্থানের প্রভেদে, ভাষার প্রভেদে, বংশের প্রভেদে, ধর্ম্মের প্রভেদে নানা জাতি। বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, তেলেঙ্গী, মহারাষ্ট্রী, রাজপুত, জাঠ, হিন্দু, মুসলমান, ইহার মধ্যে

কে কাহার সঙ্গে একতাযুক্ত হইবে? ধর্ম্মগত ঐক্য থাকিলে বংশগত ঐক্য নাই, বংশগত ঐক্য থাকিলে ভাষাগত ঐক্য নাই, ভাষাগত ঐক্য থাকিলে নিবাসগত ঐক্য নাই।" জাতিত্বের গঠনের মূলে যে ধর্মগত ঐক্য ছাড়াও ভাষা, রক্ত-সম্পর্ক ও নিবাসগত ঐক্যের কিছু না কিছু প্রয়োজন বর্তমান এই বোধ থাকা সত্ত্বেও অবশ্য বঙ্কিম ঐ এক-ই প্রবন্ধে আগাগোড়া-ই জাতি অর্থে হিন্দু জাতি নির্দেশ করেছেন। জাতি-প্রতিষ্ঠার স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসংগে তাঁর উক্তি: "আমি হিন্দু, তুমি হিন্দু, রাম হিন্দু, যদু হিন্দু, আরো লক্ষ লক্ষ হিন্দু আছে, এই লক্ষ লক্ষ হিন্দু মাত্রেরই যাহাতে মঙ্গল, তাহাতেই আমার মঙ্গল। যাহাতে তাহাদের মঙ্গল নাই, আমারও তাহাতে মঙ্গল নাই···সকল হিন্দুর কর্তব্য যে একপরামর্শী, এক মতাবলম্বী একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করে, এই জ্ঞান জাতি প্রতিষ্ঠার প্রথম ভাগ, অর্দ্ধাংশ মাত্র।"

"······হিন্দু জাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গল মাত্রেই আমাদের মঙ্গল সম্ভব নহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয় আমরা তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতি পীড়ন করিতে হয় করিব। পরজাতির অমঙ্গল সাধন করিয়া আত্মমঙ্গল সাধিতে হয় তাহাও করিব। জাতি প্রতিষ্ঠার এই দ্বিতীয় ভাগ।"

অবশ্য বঙ্কিমের মতে "এইরূপ মনোভাব নিষ্পাপ পরিশুদ্ধ ভাব বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না", কিন্তু "স্বজাতি প্রতিষ্ঠা ভালই হউক আর মন্দ হউক যে জাতিমধ্যে ইহা বলবতী হয় সে জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা প্রবলতা লাভ করে। আজিকালি এই জ্ঞান ইউরোপে বিশেষ প্রধান···ইহার প্রভাবে ইটালি এক রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে বিষম প্রতাপশালী নূতন জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে।

এবং······যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিত্ত ভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ

করিলাম—স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও জাতি প্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে তাহা হিন্দু জানিত না।"

এই হিন্দুজাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার ধারণা পরবর্ত্তীকালে রূপ নিয়েছে আনন্দমঠে (১৮৮০-১৮৮২)।

"সেই রজনীতে হরিধ্বনিতে সে প্রদেশভূমি পরিপূর্ণা হইল। সন্তানেরা দলে দলে যেখানে সেখানে উচ্চৈঃস্বরে কেহ 'বন্দেমাতরম' কেহ 'জগদীশ হরে' বলিয়া গাইয়া বেড়াইতে লাগিল। কেহ শত্রুসেনার অস্ত্র, কেহ বস্ত্র অপহরণ করিতে লাগিল। কেহ মৃতদেহের মুখে পদাঘাত কেহ অন্যপ্রকার উপদ্রব করিতে লাগিল।…সেই এক রাত্রের মধ্যে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। সকলে বলিল, "মুসলমান পরাভূত হইয়াছে দেশ আবার হিন্দুর হইয়াছে, সকলে একবার মুক্ত কণ্ঠে হরি হরি বল," গ্রাম্য লোকেরা মুসলমান দেখিলেই তাড়াইয়া মারিতে যায়। কেহ কেহ সেই রাত্রে দলবদ্ধ হইয়া মুসলমানদিগের পাড়ায় তাহাদের ঘরে আগুন দিয়া সর্বস্ব লুঠিয়া লইতে লাগিল। অনেক যবন নিহত হইল, অনেক মুসলমান দাড়ি ফেলিয়া গায়ে মৃত্তিকা মাখিয়া হরিনাম করিতে আরম্ভ করিল, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে লাগিল, "মুই হেঁদু"[১৮]

অবশ্য ঘটনা এই যে, বাঙ্গালী জাতি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে নিয়ে গঠিত। হিন্দু অথবা মুসলমান, কারুর একক প্রভুত্বে বা প্রতিষ্ঠায় বাঙ্গালীর জাতীয় প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। যে ব্যবস্থায় বাঙ্গালী জাতির অধিকাংশ মানুষ সমৃদ্ধ ও উন্নত হয়, কেবল সেই ব্যবস্থাতে-ই বাঙ্গালীর জাতীয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব। একেব ক্ষতি করে অন্যের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলে, তার ফলে সমগ্রভাবে জাতীয় উন্নতি-ই ব্যাহত হয় শুধু। তাতে জাতির অবিচ্ছেদ্য, অংশ হিসেবে সকলে-ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেউ-ই শেষ পর্যন্ত লাভবান হয় না।

নবাগত জাতীয়তাবাদ (বঙ্কিম স্বয়ং তাকে নবাগত বলেছেন) এই ভাবে তাঁর রচনায় বর্তমানের প্রয়োজনের মধ্যে, জীবনের সমস্যার মধ্যে,

---

১৮। আনন্দমঠ পৃঃ ৭৭ ঃ সাহিত্য পরিষৎ শতবার্ষিকী সংস্করণ

রূপকল্প না খুঁজে কাল্পনিক অতীত অবলম্বনে আত্মকলহের বীজ বপন করল। যদিও আনন্দমঠ যে পটভূমিকায় রচিত সেই যুগে, হেস্টিংস-এর আমলে, ইংরেজ-ই দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা এবং দেশীয়রা শিখণ্ডিস্বরূপ ইংরেজের কার্যসিদ্ধির যন্ত্র মাত্র এবং আনন্দমঠেও তথাকথিত মুসলমান কর্তৃত্বের রক্ষক ইংরেজ সৈন্য। তথাপি বঙ্কিমের স্ব-ভাবিত জাতীয়তাবাদে নতুন সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি প্রতিফলিত হয় নি—যা তাঁর তরুণ সমসাময়িক রমেশ দত্তের রচনায় প্রত্যক্ষ। আনন্দমঠ প্রকাশের দশ বৎসর পূর্বে বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধে (শিবাজী ও রনজিৎ সিং-এর উদাহরণে) যে প্রশ্ন তাঁর মনে সজীব ছিল, "যদি কদাচিৎ কোন প্রদেশখণ্ডে জাতি প্রতিষ্ঠার উদয়ে এতদূর ঘটিয়াছিল তবে সমুদয় ভারত এক জাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কিনা হইতে পারিত" এ প্রশ্নের অনুরণনও আর তৃতীয় যুগের পরিণতির মধ্যে পাওয়া যায় না।

হিন্দুত্বের সংগে জাতীয়তার সমীকরণের ফলেই বঙ্কিমের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর উদয় হয় যা কয়েক দশক বাংলার মধ্যবিত্ত হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণীকে প্রভাবিত করে। এর-ই ফলে বঙ্কিমের চেতনায় জাতীয় অস্তিত্বের সঙ্গে হিন্দুত্বের অস্তিত্ব সমার্থক বলে প্রতিভাত হয় এবং তিনি শেষ বয়সে হিন্দু ধারণার উৎকর্ষ প্রমাণ-কল্পে আত্মনিয়োগ করেন। এই ধারণার পরিণতি এই যে, স্বয়ং যুক্তিবাদী হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে সমাজ সংস্কারের ধারাকে ব্যাহত করেন; অন্তত কখন-ই সাহায্য করতে অগ্রসর হন নি।

প্রারম্ভেই লোকরহস্যের (১২৭৯ অগ্রহায়ণ, ১৮৭২ ডিসেম্বর) রঙ্গাত্মক ব্যঙ্গ লক্ষণীয়। ইংরাজ স্তোত্রে সমাজ-সংস্কারবাদকে কটাক্ষ করে তিনি বলছেন,"......হে অন্তর্যামিন আমি যাহা কিছু করি তোমাকে ভুলাইবার জন্য। তুমি দাতা বলিবে বলিয়া আমি দান করি, তুমি পরোপকারী বলিবে বলিয়া পরোপকার করি।...আমি বিধবার বিবাহ দিব, কুলীনের জাতি মারিব, জাতিভেদ উঠাইয়া দিব কেননা তাহা হইলে তুমি আমার সুখ্যাতি করিবে।...হে ইংরেজ, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।...আমার স্পীচ শুন, আমার এসে পড়ো, আমায় বাহবা

দাও—আমি তাহা হইলে সমগ্র হিন্দু সমাজের নিন্দাও গ্রাহ্য করিবনা ১৯।”

সমাজ-সংস্কারবাদের প্রতি এই বিদ্রূপ বর্ষণের কারণ হিন্দু জাতীয়তার দৃষ্টিতে সংস্কারকেরা সামাজিক উন্নতিকামী ততটা নন, যতটা ইংরেজি ভাবধারার দাস—স্থূলত ইংরেজের বশম্বদ। এই কটূক্তি যে ইতিহাস সম্মত নয় তা আমরা জানি। লক্ষনীয় এই যে এই বিশিষ্ট দৃষ্টি রামমোহনের কালে, বা বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত আন্দোলনের সময় উত্থাপিত হয়নি। তাঁদের স্বধর্মদ্রোহী পাষণ্ড ইত্যাদি বলা হয়েছে, কিন্তু ইংরেজের চাটুকার কেউ বলেন নি—কারণ হিন্দু জাতীয়তার তখনো অভ্যুত্থান ঘটে নি।

কিন্তু বঙ্কিমের সংস্কারবিরোধিতা খুব সরল বা স্থূল ছিল না। তার আশ্চর্য প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করা যাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ নিরোধ আন্দোলনে বঙ্কিম যে যুক্তিতে বহুবিবাহ নিরোধ আইনের বিরোধিতা করেন, তার অনুসরণে।

বহুবিবাহ যে সমাজের অনিষ্টকারক, সকলের বর্জ্জনীয় এবং স্বাভাবিক নীতির বিরুদ্ধ, এ বিষয়ে বঙ্কিম সম্পূর্ণ নিঃসংশয় তবু তিনি নিরোধ আইনের বিরুদ্ধে কারণ, “দশ সহস্র হিন্দুর মধ্যে একজনও অধিবেদনপরায়ণ কি না সন্দেহ। এই স্বল্প সংখ্যকদিগের সংখ্যাও যে দিন দিন কমিতেছে স্বতঃই কমিতেছে তাহাও সকলে জানেন।…ইহা দেখিয়া অনেকেই ভরসা করেন যে এই কুপ্রথার যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে তাহা আপনি হইতেই কমিবে। এমত অবস্থায় বহু বিবাহ রূপ রাক্ষস বধের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় মহারথীকে ধৃতাস্ত্র দেখিয়া অনেকেরই ডন কুইকসোটকে মনে পড়িবে।”

তাঁর মূল বক্তব্য এই। সঙ্ঘবদ্ধ সামাজিক আন্দোলন নিষ্প্রয়োজন কারণ কুপ্রথা কমে আসছে এবং সময়ে দূর হবে। কিন্তু যদি এইটুকুই তাঁর বক্তব্যের সার হত তাহলে বঙ্কিম উনিশ শতকের শেষে শিক্ষিতশ্রেণীর নেতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হতেন না। নবযুগের যুক্তিবাদকে তিনি নবযুগের

১৯। লোকরহস্য পৃঃ ২৪ সাহিত্য পরিষৎ শতবার্ষিকী সংস্করণ।

সামাজিক দাবীর বিরোধিতায় প্রয়োগ করলেন আশ্চর্য্য কৌশলে। আচার ও ঐতিহ্য যে এক নয়, ধর্ম ও প্রথা যে সমার্থক নয়, এ-কথা প্রমাণার্থে এবং তৎকালীন আইন প্রণয়নের রীতি স্মরণে রেখে বিদ্যাসাগর প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে বহুবিবাহ অশাস্ত্রীয়। বঙ্কিম বিদ্যাসাগরের এই পদ্ধতিকে আক্রমণ করলেন কারণ, "বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে যে সকল সামাজিক প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা সকলেই শাস্ত্র সম্মত বলিয়া প্রচলিত এমত নহে, যাহা লোকাচার সম্মত তাহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইলেও প্রচলিত। যাহা লোকাচার বিরুদ্ধ তাহা শাস্ত্রসম্মত হইলে প্রচলিত হইবে না।"

বলা বাহুল্য বিদ্যাসাগর তা দাবী করেন নি—যা শাস্ত্রসম্মত নয় তা শাস্ত্রের মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এই কারণেই প্রকৃত ঐতিহ্য বা শাস্ত্রের স্মরণ নিয়েছিলেন তিনি।

অতঃপর স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে এই লোকাচারের শাসন কি ভাবে দূর হতে পারে? বঙ্কিম সে প্রশ্নের ধার দিয়েও গেলেন না! আশ্চর্য যুক্তিনিষ্ঠা ও বিদ্রূপদক্ষতার সংগে প্রতিপন্ন করলেন যে 'মানবাদি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বিধি সকলের সম্পূর্ণ চলন, কোন সমাজ মধ্যে সম্পূর্ণ সম্ভব নহে। কস্মিনকালে কোন সমাজে ঐ সকল বিধি প্রচলিত ছিল কিনা সন্দেহ। সকল বিধিগুলি চলিবার নহে, অনেকগুলি অসাধ্য। অনেকগুলি পরস্পর বিরোধী।"

এই শাস্ত্রবিরোধী মুক্ত বুদ্ধি নবযুগের ঐতিহ্যসম্মত কিন্তু বঙ্কিমের হাতে এর প্রয়োগ হল রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর পর্য্যন্ত মানবিকতার যে ধারা গড়ে উঠেছিল তার বিরুদ্ধে। শাস্ত্র-মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ নিরোধ চান নি, বহুবিবাহ নিরোধের উদ্দেশ্যেই তিনি বহুবিবাহ নিরোধ চেয়েছিলেন। ঐতিহ্য এবং আইন প্রণয়নের আবশ্যিক ভিত্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য-ই শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ প্রতিপন্ন করার প্রয়োজন ছিল তাঁর। বিদ্যাসাগরের হৃদয়ে যে জীবন্ত বেদনাবোধ ছিল, বঙ্কিমের মানসে কালক্রমে তা আর ছিল না বলে-ই বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে বুদ্ধির আড়ম্বর প্রকাশ করে তিনি শান্ত থাকতে পেরেছিলেন। সমাজসংস্কারে বিদ্যাসাগর কেন শাস্ত্রের শরণাপন্ন

হয়েছিলেন সে বিষয় তিনি নিজেই স্পষ্টত উল্লেখ করেছিলেন, "যদি যুক্তিমাত্র অবলম্বন করিয়া ইহাকে (বিধবাবিবাহ) কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর তাহা হইলে এতদ্দেশীয় লোক কখনই ইহাকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না; যদি শাস্ত্রে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই তাঁহারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারেন।......এদেশে শাস্ত্রই সর্ব্ব প্রধান প্রমাণ এবং শাস্ত্রসম্মত কর্ম্মই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। অতএব বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম, ইহার মীমাংসা করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক[২০]। যে যুক্তিতে বঙ্কিম বহুবিবাহ নিরোধে আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বনের বিরোধিতা করেন, তা-ই অন্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে কি পরিণাম হয় দেখা যাক। যদি বলা হত যে প্রতি দশ সহস্র বাঙ্গালী বা হিন্দুর মধ্যে একজনও নরহত্যাকারী কি না সন্দেহ এবং অষ্টাদশ শতকে যে পরিমাণ নরহত্যা হত উনবিংশ শতকে তা আর হয় না, সুতরাং নরহত্যা সংক্রান্ত আইনের কোন প্রয়োজন নেই, তবে বঙ্কিমের কাছে, বা তৎকালীন শিক্ষিত হিন্দুর কাছে, তা ভীত ও ক্রুদ্ধ প্রত্যাখ্যানের সৃষ্টি করত নিশ্চয়। বহুবিবাহ নিরোধ ততদূর আবশ্যক বিবেচিত হয়নি, কারণ তা নরহত্যা নয় নারীহত্যা। বহুবিবাহের খড়্গ স্ত্রীলোকের শিরে উদ্যত থাকলে তার সামাজিক জীবন যে কত বিঘ্নিত হয় ও সামান্য ত্রুটি ঘটলেও সর্বাঙ্গীণ অনিশ্চয়তার উদ্ভব হয় এবং সে যে কোন অবস্থাতেই আইনত ও কার্যত পুরুষের সমস্তরে দাঁড়াতে পারে না, এই বাস্তব বিচারে তিনি অবতীর্ণ হন নি। অথচ দ্বারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-এর (১৮৪৪-৯৮) জীবনী থেকে জানা যায় যে তখনও বহুবিবাহ সমস্যা কী তীব্র ছিল। বিশেষত কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজে। বস্তুত বাঙালী হিন্দু সমাজে স্বামী-

২০। বিধবাবিবাহ ১ম পুস্তক বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী—সমাজ, পৃঃ ২৪, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ।

পরিত্যক্তা স্ত্রীলোকদের যে সমস্যা এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি তার কারণ হিন্দু সমাজে বিবাহিত স্ত্রীলোকের বিবাহিত জীবনে নিজস্ব কোন দাবী বা অধিকারের অনুপস্থিতি। এবং এই অবস্থার জন্য বঙ্কিম ও তদুত্তর শিক্ষিতদের নৈতিক অসাড়তা যে বহুলাংশে দায়ী তা এই কালের ব্যবধানেও অস্বীকার করা চলে না।

বস্তুত স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বঙ্কিমের চিন্তার স্ব-বিরোধিতা প্রকট। অন্য বহু ক্ষেত্রে যেমন, স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধের বিষয়েও, যখন তিনি নীতিগতভাবে আলোচনা করেছেন, তখন আশ্চর্য মুক্ত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তিনি। কিন্তু যখন-ই বিশেষ কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন বা নির্দিষ্ট আদর্শ-রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন, তখন-ই তাঁর পশ্চাদমুখী মানসিক প্রবণতা বেগবান হয়ে উঠেছে। সাম্য (১৮৭৯) গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে বঙ্কিমের সবচেয়ে বৈপ্লবিক গ্রন্থ। স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধের ক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকারের বিষয়ে অনেক ক্ষুরাগ্র উক্তি গ্রন্থটিতে বর্তমান। বস্তুত সাম্যের পঞ্চম পরিচ্ছেদে শুদ্ধ মাত্র নারীর সমানাধিকারের দাবী-ই আলোচিত হয়েছে। নারীর শিক্ষার অধিকার সোৎসাহে সমর্থিত হয়েছে এতে, এবং খোলা স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে যে, 'যাহাকে গৃহধর্ম বলে, তাহা আজিও স্ত্রী পুরুষের উভয়েরই তুল্য হাতে সমান ভাগে।' যদিও সেই সাম্য স্বভাব-সঙ্গত কিনা এ বিষয়ে পরক্ষণে-ই মানসিক অস্থিরতা প্রকাশ করেছেন তিনি। কিন্তু বিধবা বিবাহের মত সুনির্দিষ্ট একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়ায় কুণ্ঠার আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। সাম্যতত্ত্বের প্রয়োজনে যদিও তিনি স্বীকার করেন যে, "বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভালো" কিন্তু তাঁর সংস্কার এই যে, "যে স্ত্রী সাধ্বী-পূর্ব্ব পতিকে আন্তরিক ভালবাসিয়াছিল সে কখনই পুনর্ব্বার পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না। যে জাতিগণের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে সে সকল জাতির মধ্যেও পবিত্র স্বভাব বিশিষ্টা, স্নেহময়ী সাধ্বীগণ বিধবা হইলে কদাপি আর বিবাহ করে না।" (প্রথম প্রকাশঃ বঙ্গদর্শন ১৮৭৫)

সাম্য গ্রন্থে যে দ্বিধা সংস্কাররূপে প্রচ্ছন্ন, পরবর্তীকালে ধর্ম্মতত্ত্ব-এ

(১৮৮৮) যখন তিনি জাতীয়তার বোধকে হিন্দুত্বের আদর্শে গঠন করতে চেয়েছেন তখন তা সামাজিক আদর্শ রূপেই প্রতিভাত হয়েছে তাঁর কাছে। যদিও নীতির দিক থেকে "স্বামী সকল বিষয়ের স্ত্রীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি ভক্তির পাত্র..." (ধর্ম্মতত্ত্ব ১০ম অধ্যায়) একথা বলার পর তিনি ঘোষণা করেছেন, "যেখানে স্ত্রী স্নেহে, ধর্ম্মে বা পবিত্রতায় শ্রেষ্ঠ সেখানে তাহার স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত বটে", কিন্তু যখন-ই অধিকারের প্রশ্ন এসেছে তখন-ই তাঁর সংস্কার প্রবল প্রত্যয়ের আকারে সে দাবী প্রত্যাখ্যান করেছে। যথা,—

"শিষ্য। তবে পাশ্চাত্যেরা যে স্ত্রী পুরুষ সাম্য স্থাপন করিতে চাহেন সেটা সামাজিক বিড়ম্বনা মাত্র?

গুরু। সাম্য কি সম্ভবে? পুরুষ কি প্রসব করিতে পারে? পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকের পল্টন লইয়া লড়াই চলে কি ২১?

এবং নারীর শরীরচর্চ্চার বিরুদ্ধে—

"গুরু। যাহার যে শক্তি আছে সে তাহার অনুশীলন করিবে। স্ত্রীলোকের যুদ্ধ করিবার শক্তি থাকে, তাহা অনুশীলিত করুক, পুরুষের স্তন্যপান করাইবার শক্তি থাকে অনুশীলিত করুক।

শিষ্য। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে পাশ্চাত্য স্ত্রীলোকেরা ঘোড়ায় চড়া বন্দুক ছোড়া প্রভৃতি পৌরুষ কর্ম্মে বিলক্ষণ পটুতা লাভ করিয়া থাকে।

গুরু। অভ্যাস ও অনুশীলনের যে প্রভেদের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহা স্মরণ কর। অনুশীলন শক্তির অনুকূল, অভ্যাস শক্তির প্রতিকূল। অনুশীলনে শক্তির বিকাশ অভ্যাসে বিকার ২২।"

অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষ সম্পূর্ণ একাকার বা identical নয় বলে তারা সমান বা সমানাধিকার-সম্পন্ন বা equal হতে পারবে না। সমস্ত অগণতান্ত্রিক দর্শনের ভিত্তি এই ধারণা। এর মৌলিক দুর্বলতা বঙ্কিম স্বয়ং উদ্‌ঘাটন করেছেন সাম্যের প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক বৈষম্যের বিচারে; একের কারণে যে অন্যের সমর্থন যথার্থ নয় এ বোধ তাঁর

২১। ধর্ম্মতত্ত্ব: পৃঃ ১২১ সাহিত্য পরিষৎ, শতবার্ষিকী সংস্করণ।

২২। ধর্ম্মতত্ত্ব: পৃঃ ১২২, ঐ।

বুদ্ধিকে স্পর্শ করলেও শেষ পর্য্যন্ত তাঁর সংস্কারের সীমা অতিক্রম করতে পারে নি।

এর ফলে বুদ্ধিও কিভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে দেখা যাক। স্ত্রী-পুরুষের অসাম্যের যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন তাতে পুরুষের-ই অক্ষমতা সূচিত হয়েছে। পুরুষের পক্ষে উল্লিখিত অক্ষমতাগুলি প্রকৃতিনিহিত, অনুশীলন বা অভ্যাসের অযোগ্য, স্ত্রীলোকের পক্ষে যুদ্ধ ইত্যাদি তদ্রূপ নয়।

তাছাড়া অভ্যাস ও অনুশীলনে কাল্পনিক পার্থক্য যাই থাক্, স্ত্রীলোকের শক্তিচর্চা তার গুণের প্রতিকূল, এটা স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে বিশেষ এক ধারণার প্রতিফলন হতে পারে, কিন্তু এটা প্রাকৃতিক সত্য বা বাস্তব ঘটনা নয়। প্রাকৃতিক ও সামাজিক অক্ষমতাকে এক পর্যায়ে ফেলার ফলে, তিনি নারীর অধিকার-সংকোচের কোন বাস্তব প্রমাণ পান নি, সংস্কার থেকে সমর্থন জানিয়েছেন শুধু।

বহুবিবাহ সম্বন্ধে পরিণত বয়সে তিনি যে মত দেন তাতেও নারীর অধিকারহীনতার মূল প্রশ্নটি তাঁর বিবেচনা এড়িয়ে গিয়েছে। কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে (১৮৮৬) দেখি, "সচরাচর অকারণে পুরুষের একাধিক বিবাহ অধর্ম। কিন্তু সকল অবস্থাতে নহে। যাহার পত্নী কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত বা এরূপ রুগ্ন যে সে কোনমতেই সংসার ধর্মের সহায়তা করিতে পারে না, তাহার যে দারান্তর পরিগ্রহ পাপ এমন কথা বুঝিতে পারি না ২৩।"* যার স্বামী অনুরূপ রোগগ্রস্ত সেই স্ত্রীলোকের কি কর্তব্য, এবিষয়ে অবশ্য তিনি

২৩। কৃষ্ণচরিত্র পৃঃ ১৫৬ সাহিত্য পরিষৎ শতবার্ষিকী সংস্করণ।

* এ বিষয়ে, এবং ঠিক এই বিষয়ে-ই তিনি সাম্যে (১৮৭৯) বলেন: "মনুষ্য-জাতি মধ্যে কাহার-ই বহুবিবাহে অধিকার নীতিসঙ্গত হইতে পারে না। কদাচিৎ হইতে পারে বোধ হয়, বোধহয় বলিতেছি কেন না, ইহা স্বীকার করিলে পুরুষের বিপক্ষেও সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়। বস্তুতঃ বহুবিবাহ পক্ষে দুই একটা কথা আছে কিন্তু আমার বিবেচনায় বহুবিবাহ এমন একটা কদর্য্য প্রথা যে সে সকল প্রকার উল্লেখ মাত্রেও অনিষ্ট আছে"। (সাম্য, পৃঃ ৪১-৪২ (পাদটিকা), সাহিত্য পরিষৎ শতবার্ষিকী সংস্করণ)। বিস্মিত হবার কিছু নেই যে, ভক্তিতত্ত্বের অভ্যুদয়ে সাম্যের প্রচার তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

নীরব। এবং সাম্য গ্রন্থে এ-বিষয়ে তাঁর সচেতনতা স্মরণে রাখলে এই নীরবতা বিশেষত বিস্ময়কর মনে হয়। এরূপ রুগ্ন স্ত্রীর চিকিৎসার দায়িত্ব কার তাও অনুচ্চারিত। "কিন্তু যাহার স্ত্রী ধর্মভ্রষ্টা কুলকলঙ্কিনী সে যে কেন আদালতে না গিয়া দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিতে পারিবে না তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসে না ২৪।" সংস্কার যে বিচার-বুদ্ধিকে কতদূর আচ্ছন্ন করতে পারে উপরোক্ত উক্তিটি তার দৃষ্টান্ত। উনিশ শতকের শিক্ষিতাগ্রগণ্য বঙ্কিম কখনই মঁতেস্কুর (১৬৮৯-১৭৫৫) *L'espirit des Lois*-র সঙ্গে অপরিচিত ছিলেন না। তিনি এবিষয়ে অবহিত ছিলেন যে, অভিযোক্তা স্বয়ং যেখানে বিচারক সেখানে সত্যনির্ণয় বা সুবিচার কখন-ই সম্ভব নয়। আদালতের প্রয়োজন এই কারণে-ই আসে যে, কে ধর্মভ্রষ্টা এবং কে তা নয় তা কোন ব্যক্তি-বিশেষের মুখের কথায় এবং যে ব্যক্তি স্ত্রীর বিবাহিত জীবনের অধিকার পুনর্বিবাহের দ্বারা অস্বীকার করতে অগ্রসর—তার মুখের কথায় নির্ণিত হতে পারে না। কিন্তু বঙ্কিমের চিন্তায় বিচারের এই দিকটি প্রতিফলিত-ই হয়নি। বস্তুত পিতৃ-তান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর সংরক্ষণ-ই তাঁর কাম্য এবং তার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তাই নীতি। অষ্টাদশ শতকের যে *Abstract reason*-এর বা শুদ্ধ যুক্তির ধারণা, যা সমাজের ক্ষেত্রে শ্রেণীনিরপেক্ষ মানবিক সাম্য ও মানবাধিকারের স্রষ্টা, সেই যুক্তিবাদ থেকেও তিনি শেষ বয়সে অপসরণ করেন। কারণ তাঁর ধারণায় "যাহার উত্তরাধিকারীর প্রয়োজন কিন্তু স্ত্রী বন্ধ্যা সে যে কেন দারান্তর গ্রহণ করিবে না, বুঝিতে পারি না ২৫।" অথচ এটা বোঝা তাঁর পক্ষে খুব কঠিন ছিল না যে সমাজে স্বীয় সন্তান ব্যতীত অন্য উত্তরাধিকারী মানুষের থাকে এবং হিন্দু-সমাজেও দত্তক ইত্যাদি প্রথার সাহায্যে উত্তরাধিকারী গ্রহণের রীতি সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু পতি-পরিত্যক্তা স্ত্রীর দ্বিতীয় কোন গতি হিন্দুসমাজে নেই। এবং বন্ধ্যাত্ব যখন পতি-পত্নী উভয়ের-ই সম্ভব, তখন বন্ধ্যা পত্নীর অধিকারচ্যুতি

২৪। কৃষ্ণচরিত্র: পৃ: ১৫৬।

২৫। কৃষ্ণচরিত্র, পৃঃ ১৫৬।

শুধু অন্যায় নয় অকার্যকরীও বটে। এক্ষেত্রে প্রাচীন নিয়োগ-প্রথার প্রবক্তারা নব্যহিন্দুদের তুলনায় অনেক যুক্তিযুক্ত ছিলেন।

বঙ্কিম যে এ কথা বুঝতে পারেননি তার কারণ তাঁর বুদ্ধির দৈন্য নয়, তার কারণ সম্পত্তি-ভিত্তিক পরিবারের প্রয়োজন-ই তাঁর মতে একমাত্র বিবেচ্য ব্যাপার। নারীর অধিকারের প্রশ্ন সেখানে অবান্তর।

বস্তুত হিন্দুত্বের সংগে জাতীয়তার সমীকরণের ফলে জাতীয় প্রয়োজন হিসেবে বঙ্কিমের চিন্তায় একদিকে যেমন হিন্দুত্বের ধারণাকে যুগোপযোগী করার উৎসাহ সঞ্চারিত হয়, অপরপক্ষে হিন্দু সমাজ-কাঠামোর সংরক্ষণ ও সমর্থন আবশ্যিক হয়ে পড়ে। বঙ্কিমের মতাদর্শের আলোচনা তাই অনিবার্য্য ভাবে-ই বিভ্রান্তিকর। কারণ নীতির দিক থেকে তিনি অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু আচার ও শাস্ত্রের সমালোচনা করেছেন কুণ্ঠাহীন নির্মমতার সঙ্গে, কিন্তু প্রত্যেক সামাজিক প্রশ্নে প্রচলিত ব্যবস্থার সমর্থন ও সম্প্রসারণের-ই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন শুধু। এর ফলে নৈতিক সমালোচনাও শেষ পর্য্যন্ত সামাজিক পশ্চাদপসরণের সমর্থনে ব্যবহৃত হয়েছে। স্ত্রী-পুরুষের প্রশ্নে এই নৈতিক দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যায় দেবী চৌধুরাণীর (১৮৮৪) প্রফুল্ল চরিত্রের পরিণতিতে। স্বয়ং বঙ্কিমের মতে চরিত্রটি ধর্ম্মতত্ত্বের, নিষ্কাম ও অনুশীলন ধর্ম্মের আদর্শে গঠিত। একাদিক্রমে দশ বৎসর বিশুদ্ধ নিষ্কাম ধর্মচর্চা করার পর এই প্রফুল্ল তার নিষ্কাম ধর্মার্জিত উন্নততর শক্তি নিয়োগ করল একটি প্রবঞ্চকের সম্পত্তি বিস্তারে; যথা: "তালুক মুলুকের কাজ বাহিরে হইত বটে কিন্তু একটু কিছু বিবেচনার কথা উঠিলে কর্ত্তা আসিয়া গিন্নীকে বলিতেন, নতুন বৌমাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, তিনি কি বলেন? প্রফুল্লর পরামর্শে সব কাজ হইতে লাগিল বলিয়া দিন দিন লক্ষ্মীশ্রী বাড়িতে লাগিল ২৬।" এবং একটি উদ্দেশ্যহীন অপোগণ্ডের সন্তান ধারণে, "যথাকালে পুত্র পৌত্রে সমাবৃত হইয়া প্রফুল্ল স্বর্গারোহণ করিল।" কিন্তু এত সবের কারণ কি? কারণ, "প্রফুল্ল নিষ্কাম ধর্ম্ম অবলম্বন অভ্যাস করিয়াছিল। প্রফুল্ল সংসারে আসিয়া যথার্থ সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল। তার কোন কামনা ছিলনা, কেবল

২৬। দেবী চৌধুরাণী পৃঃ ১৪৯ সাহিত্য পরিষদ, বঙ্কিম শতবার্ষিকী সংস্করণ।

কাজ খুঁজিত। কামনা অর্থে আপনার সুখ খোঁজা, কাজ অর্থে পরের সুখ খোঁজা" ২৭। কিন্তু ভেদ-জ্ঞান দূরীভূত হলে এই আত্ম-পর পার্থক্য থাকে কি? এই "পর"ও অবশ্য পারিবারিক গণ্ডীর বাইরে নয়। তাছাড়া এই কাজের প্রকৃতি কি? "......কেহ জানিলনা যে তাহার অক্ষর পরিচয়ও আছে, গৃহ ধর্ম্মে বিদ্যা প্রকাশের প্রয়োজন নাই। গৃহ ধর্ম্ম বিদ্বানেই সুসম্পন্ন করিতে পারে বটে, কিন্তু বিদ্যা প্রকাশের স্থান সে নয়। যেখানে বিদ্যা প্রকাশের স্থান নহে সেখানে যাহার বিদ্যা প্রকাশ পায় সেই মূর্খ। যাহার বিদ্যা প্রকাশ পায় না সেই পণ্ডিত ২৮!"

এখানে 'প্রকাশ' শব্দটির দুটি স্বতন্ত্র অর্থে (একটি সরলার্থ, অপরটি "জাহির") ব্যবহারের মধ্যে যে বক্র-বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য আছে তার সাহায্যে তাঁর বক্তব্যের রূঢ়তাকে আবরণ দেবার চেষ্টা করলেও স্থূল বক্তব্য অতি স্পষ্ট। নিষ্কাম কর্মাজিত গৃহধর্মে অক্ষর পরিচয় কার্যত অবান্তর। গৃহধর্ম সম্বন্ধে এই ধারণা যে সমাজের বিশেষ একটা অবস্থায় সম্ভব, পরিবর্তিত অবস্থায় যে গৃহধর্ম-পালনেও অক্ষর জ্ঞান ও তার প্রকাশ আবশ্যিক হয়ে পড়ে, সত্যের এই গতিশীল রূপ হৃদয়ঙ্গম করেননি তিনি। সুতরাং এরপর বিস্মিত হবার কিছু নেই যে, কৃষ্ণকান্তের উইলে সাহিত্য-সৃষ্টির. দ্বিতীয় যুগের প্রান্তে ভ্রমর যখন অন্যানুরাগী স্বামীকে বলতে পেরেছিল, "যতদিন তুমি আমার ভক্তির যোগ্য ততদিন আমার ভক্তি", সে-ক্ষেত্রে হিন্দুমহিমার পরিণতির যুগে বহু-পত্নীক ব্রজেশ্বরকে, "প্রফুল্ল বলিত, আমি একা তোমার স্ত্রী নহি। তুমি যেমন আমার, তেমনি সাগরের, তেমনি নয়ান বউ-এর। আমি একা তোমাকে ভোগ দখল করিব না...স্ত্রীলোকের পতি দেবতা, তোমাকে ওরা পূজা করিতে পায় না কেন?...আমায় যেমন ভালবাস উহাদিগকেও তেমনি ভাল না বাসিলে, আমার উপর তোমার ভালবাসা সম্পূর্ণ হইল না। ওরাও আমি।" নিষ্কাম কর্ম ও সর্বজীবে সমভাবের এই হল পরিণাম।

এবং তার জন্যে-ই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "সূক্ষ্মতম তর্কজাল-এর দ্বারা

২৭। দেবী চৌধুরাণী পৃঃ ১৪৮।

২৮। ঐ পৃঃ ১৪৮।

স্থূলতম জড়ত্বের" সমর্থন যা উনিশ শতকের বাঙ্গালী বুদ্ধির একটি বিশেষ লক্ষণ এবং যার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলে বিদ্যাসাগরকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন তিনি—সেই ধারার প্রধান উদ্যোক্তা হিসেবে পরিণত বঙ্কিমকে-ই নির্দেশ করতে হয়।

হিন্দু জাতীয়তার আদর্শকার হিসেবে বঙ্কিম সমাজের সর্বাঙ্গীন সমস্যার বিষয় চিন্তা করেছিলেন। এবং পরাধীন দেশে সমাজ দার্শনিক হিসেবে তিনি দুটি স্বতন্ত্র সমস্যার আলোচনায় অবতীর্ণ হন। (১) সমাজের তথা হিন্দু সমাজের বর্তমান অবনতির হেতু কি, (২) সমাজের পুনরুজ্জীবনের উপায় কি? একজন যুক্তিবাদী দার্শনিকের কাছে অবশ্য এতদুভয় প্রশ্ন-ই পরস্পরের পরিপূরক, কারণ যে যে কারণে সমাজের বর্তমান অবনতি, সেই সমস্ত কারণগুলি উৎসন্ন না করলে সমাজের পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়। বাংলার নবযুগে সমাজ-সংস্কারের প্রেরণা প্রধানত এই বোধ থেকে এসেছিল। বিংশ শতকের ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনেও এক-ই কারণে সমাজ-সংস্কার বা গঠনমূলক আন্দোলন অনিবার্য হয়ে পড়ে।

বঙ্গদর্শন আত্মপ্রকাশের কালে বঙ্কিম হিন্দুসমাজের অবনতির কারণ সম্বন্ধে স্পষ্টত গভীর ভাবে চিন্তা করেছিলেন। এই চিন্তার প্রত্যক্ষ ও উজ্জ্বল পরিচয় "সাম্য" ২৯ এবং 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। ভারতের অধঃপতনের কারণ হিসেবে সাম্যে তাঁর বক্তব্য খুব স্পষ্ট: "...সমাজের উন্নতি রোধ বা অবনতির যে সকল কারণ আছে অপ্রাকৃতিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার প্রধান কারণ। ভারতবর্ষের

২৯ 'বঙ্গদেশের কৃষক' এর কোন কোন অংশ 'সাম্য' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়। পরিণত বয়সে বঙ্কিম স্বয়ং 'সাম্য'-এর প্রচার রোধ করলে, 'বঙ্গদেশের কৃষক' পূর্ণাকারে পুনর্বার প্রকাশিত হয়।

বঙ্গদেশের কৃষকে উল্লিখিত অর্থনৈতিক মতামতগুলি সম্পর্কে পরিণত বয়সে মতানৈক্য স্বীকার করলেও তিনি সেগুলি সংশোধন করেন নি বা সাম্যের মত প্রত্যাহার করে নেন নি।

যে এতদিন হইতে এত দুর্দ্দশা সামাজিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার বিশিষ্ট কারণ" ৩০।

"পৃথিবীতে যত প্রকার সামাজিক বৈষম্যের উৎপত্তি হইয়াছে ভারতবর্ষের পূর্বকালিক বর্ণ বৈষম্যের ন্যায় গুরুতর বৈষম্য কখন কোন সমাজে প্রচলিত হয় নাই। এই গুরুতর বর্ণ বৈষম্যের ফলে ভারতবর্ষ অবনতির পথে দাঁড়াইল। সকল উন্নতির মূলে জ্ঞানোন্নতি, বর্ণ বৈষম্যে জ্ঞানোন্নতির পথ রোধ হইল...শূদ্র জ্ঞানালোচনার অধিকারী নহে...ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক ব্রাহ্মণেতর বর্ণ, সুতরাং অধিকাংশ লোক মূর্খ হইল। মনুষ্যে মনুষ্যে প্রকৃত বৈষম্য আছে। যেমন প্রকৃত বৈষম্য আছে—প্রকৃত বৈষম্য অর্থাৎ যে বৈষম্য প্রাকৃতিক নিয়মানুরুদ্ধ—তেমনি অপ্রাকৃত বৈষম্য আছে। ব্রাহ্মণে শূদ্রে অপ্রাকৃত বৈষম্য।"

"এই সংসার বৈষম্যময়, সকল দেশই বৈষম্য জালে আচ্ছন্ন। উন্নতিশীল সমাজে, সামাজিকেরা পরস্পর সংস্লিষ্ট হইয়া সেই বৈষম্যকে অপনীত করিয়াছেন। সেই সকল রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। রোম ইহার প্রধান উদাহরণ।"

"মনে কর যদি ইংলণ্ডে এইরূপ নিয়ম থাকিত যে রসেল (Russell,) কাবেন্দিষ (Cavendish,) স্তানলি (Stanley) প্রভৃতি কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট বংশের লোক ভিন্ন আর কেহ বিদ্যার আলোচনা করিতে পারিবেনা তাহা হইলে ইংলণ্ডের এ সভ্যতা কোথায় থাকিত? কবি, দার্শনিক, বিজ্ঞানবিৎ দূরে থাকুক, ওয়াট, ষ্টিভেনসন, অর্করাইট, কোথায় থাকিত ৩১ !"

সমাজে সাধারণের মধ্যে জ্ঞানের চর্চা বা ধারণা যদি সামগ্রিক ভাবে অনুপস্থিত থাকে, কর্মী সাধারণ যদি অজ্ঞ হয় এবং নিজেদের কর্মের ধারা ও পদ্ধতি সম্বন্ধে বিচার করার ক্ষমতা অর্জন না করে, তাহলে আপন অভিজ্ঞাকে তারা যাচাই করতে পারে না। কাজের রীতি, নীতি ও প্রয়োজন কি বুঝতে অক্ষম হয়। ফলে নতুন আবিষ্কারের উদ্ভব হয় না।

৩০। সাম্য, পৃঃ ৫ সাহিত্য পরিষৎ শতবার্ষিকী সংস্করণ।

৩১। সাম্য, পৃঃ ৬-৭, : ঐ।

এবং এই কারণে-ই আজকের উন্নতিশীল দেশগুলিতে শ্রমিকদের বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া এবং বৈজ্ঞানিকদের শ্রমিক-সাধারণের অভিজ্ঞতার অংশীদার হওয়ার উপর, এত গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শিল্প-বিপ্লবের সূচনায় প্রধান যান্ত্রিক আবিষ্কার গুলি যাঁরা উদ্ভাবন করেন তাঁরা সকলেই যে স্বয়ং শ্রমিক, এটা আদৌ বিস্ময়কর নয়। আপনাপন কাজের প্রকৃতি ও প্রয়োজন সম্বন্ধে তাঁরা অবহিত ছিলেন এবং ছিলেন বলে-ই নতুন কর্ম-কৌশল তথা যন্ত্র উদ্ভাবন করতে পেরেছিলেন। বস্তুত মানুষের জ্ঞান, মানুষের সামগ্রিক অভিজ্ঞতার সুসংবদ্ধ পরিণাম ফল। কাজে-ই শ্রমিক—সাধারণ, যারা স্বয়ং সামাজিক কর্ম তথা অভিজ্ঞতার স্রষ্টা ও মৌল আধার, তাদের বুদ্ধিবৃত্তি যদি অপরিণত ও অশিক্ষিত থাকে তাহলে সেই সমাজে নতুন শিল্পরীতি, তথা নতুন ধারণা এবং শেষ পর্য্যন্ত নতুন জ্ঞানের বিকাশ রুদ্ধ হয়। কলাকৌশল স্থাণু থাকে। সংক্ষেপে সমাজ-প্রগতি অসম্ভব হয়। ভারতের জাতিভেদ প্রথার এইটেই সবচেয়ে বিপজ্জনক পরিণাম। গণশিক্ষার অভাবের সংগে আবিষ্কারের অনুপস্থিতির যে যোগ, বঙ্কিম যে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন, আর্করাইট ও ষ্টিভেনসন সম্বন্ধে তাঁর উক্তি থেকে তা স্পষ্টত বোঝা যায়। তাঁর সমাজচিন্তা যে সে সময়ে কতদূর স্বচ্ছ ও অগ্রসর ছিল তা এই সময়ের ব্যবধানেও চিন্তা করলে বিস্মিত হতে হয়। তিনি এ বিষয়ে আরো স্পষ্টত বলেন যে, "...কিন্তু কেবল তাহাই নহে। অনন্যসহায় ব্রাহ্মণেরা যে বিদ্যার আলোচনা একাধিকার করিলেন তাহাও বর্ণ বৈষম্য দোষে কুফলপ্রদা হইয়া উঠিল। সকল ধর্মের প্রভু হইয়া তাঁহারা বিদ্যাকে প্রভুত্ব রক্ষণীরূপে নিযুক্ত করিলেন। বিদ্যার যেরূপ আলোচনায় সেই প্রভুত্ব বজায় থাকে...সেইরূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন ৩২...।"

বঙ্গদেশের কৃষকে সামাজিক ভেদের রাজনৈতিক রূপ ও পরিণাম সম্বন্ধে সুস্পষ্ট আলোচনা চোখে পড়ে। তৎকালীন প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশ, লোক সংখ্যা ইত্যাদিকে দায়ী করে সাম্রাজ্যবাদী দার্শনিকেরা ভারতের চিরস্থায়ী অধোগতির অনিবার্যতা

৩২। সাম্য, পৃঃ ৭।

ও সংগে সংগে সাম্রাজ্যবাদের অবিনশ্বর অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করতেন। "কি কারণে ভারতবর্ষের প্রজা চিরকাল উন্নতি হীন" ৩৩ এই প্রসঙ্গে বঙ্কিম বলেন যে, "শ্রমোপজীবীদিগের দুরবস্থা যে চিরস্থায়ী হয়, কেবল তাহাই নহে, তন্নিবন্ধন সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের লোকের গৌরব ধ্বংস হয়।" সংক্ষেপে শ্রমজীবীদের অধোগতির দরুণ সমগ্রভাবে সমাজের অধোগতি ঘটে। এই সূত্রে তিনি যে রাজনৈতিক তত্ত্বের অবতারণা করেছেন তা গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তি-স্বরূপ। "...যদি পৃথিবীর পুরাবৃত্তে কোন কথা নিশ্চিত প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তবে সে কথাটি এই যে সাধারণ প্রজা সতেজঃ এবং রাজ প্রতিদ্বন্দ্বী না হইলে রাজপুরুষদিগের স্বভাবের উন্নতি হয় না, অবনতি হয়। যদি কেহ কিছু না বলে রাজপুরুষরা সহজেই স্বেচ্ছাচারী হয়েন। যে দেশে প্রজার অবস্থা ভাল সে দেশে রাজপুরুষদিগের এরূপ দুর্গতি ঘটে না। তাহারা

---

৩৩ বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা ও (১৮৭২) প্রসঙ্গত স্মরণীয়:

প্রধান কথা এই যে, এক্ষণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চ শ্রেণী এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চ শ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা, মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা ধনবান এবং কৃতবিদ্যদিগের কোন সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক। ....

.........যদি আপামর সাধারণ উদ্ধত না হইল, তবে যাঁহারা শক্তিমন্ত তাঁহাদিগের-ই উন্নতি কোথায়! এরূপ কখন কোন দেশে হয় নাই যে, ইতর লোক চিরকাল এক অবস্থায় রহিল, ভদ্রলোকদিগের অবিরত শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বরং যে যে সমাজের উন্নতি হইয়াছে সেই সেই সমাজে উভয় সম্প্রদায় সমকক্ষ, বিমিশ্রিত এবং সহৃদয়তাসম্পন্ন।.........রোম, এথেন্স' ইংলণ্ড এবং আমেরিকা ইহার উদাহরণ স্থল।" (দ্রষ্টব্য: বিবিধ প্রবন্ধ; পৃঃ ২২৪, সাহিত্য পরিষৎ শতবার্ষিকী সংস্করণ)

পরবর্তীকালে এই সহৃদয়তার প্রয়োজন সম্বন্ধে তাঁর প্রয়োজন-বোধ ক্ষীণ হয়। কর্তৃস্থানীয়দের প্রতি আনুগত্য অধোস্থানীয়দের কর্তব্য বলে নির্দিষ্ট হয়। এবং উন্নতির উদাহরণ হিসাবে প্রাচীন ও আধুনিক গণতন্ত্র নয়, জার্মানি ও ইতালীর মত সেকালের নবীন অগণতন্ত্রী রাজতন্ত্রগুলি নির্দিষ্ট হয়।

রাজার দুর্গতি দেখিলে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে এবং হইয়া থাকে। বিরোধে উভয় পক্ষের-ই উন্নতি। রাজপুরুষগণ অসমর্থক বিরোধের ভয়ে সতর্ক থাকেন। কিন্তু বিরোধে কেবল যে এই উপকার ইহা নহে। নিত্য মল্লযুদ্ধে বল বাড়ে।···বিরোধে মানসিক গুণ সকলের সৃষ্টি এবং পুষ্টি হয়। নির্বিরোধে তৎসমুদায়ের লোপ। শূদ্রের দাসত্বে ক্ষত্রিয়ের ধন ও ধর্ম্মের লোপ হইয়াছিল।···যেমন অধঃশ্রেণীর প্রজার অবনতিতে ক্ষত্রিয়-দিগের প্রভুত্ব গড়িয়া পরিশেষে লুপ্ত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণদিগেরও তদ্রূপ। আমরা সেইরূপে বলি, সেইরূপে শুইবে, সেইরূপে খাইবে, সেইরূপে বসিবে, সেইরূপে হাটিবে, সেইরূপে কথা কহিবে, সেইরূপে হাসিবে, সেইরূপে কাঁদিবে. তোমার জন্মমৃত্যু পর্য্যন্ত আমাদের ব্যবস্থার বিপরীত হইতে পারিবে না···জালের এইরূপ সূত্র। কিন্তু পরকে ভ্রান্ত করিতে গেলে আপনিও ভ্রান্ত হইতে হয়, কেননা ভ্রান্তির আলোচনায় ভ্রান্তি অভ্যস্ত হয়। যে জালে ব্রাহ্মণেরা ভারতবর্ষকে জড়াইলেন, তাহাতে আপনারাও জড়িত হইলেন ··মানুষের স্বেচ্ছানুবর্তিতার প্রয়োজনাতিরিক্ত রোধ করিলে সমাজের অবনতি হয়। হিন্দু সমাজের অবনতির জন্য যত কারণ নির্দেশ করিয়াছি তন্মধ্যে এই বোধ হয় প্রধান, অদ্যাপি জাজ্বল্য-মান। ইহাতে রুদ্ধ এবং রোধকারী সমান ফলভাগী···নিয়মজালে জড়িত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের বুদ্ধিস্ফূর্তি লুপ্ত হইল···ব্রাহ্মণদিগের মানস ক্ষেত্র মরুভূমি হইল ৩৪।” সুতরাং সূচনায় তাঁর মতে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী বা গোষ্ঠী থাকলেও সামাজিক উন্নতি সম্ভব যদি তাদের মধ্যে অধিকার-সচেতনতা এবং দ্বন্দ্ব থাকে ; যদি মানুষের স্বেচ্ছানুবর্তিতা অর্থাৎ স্বাধীনতা থাকে। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন ঘটে। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ধর্ম্মতত্ত্বে দেখি : “যিনি আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং যাঁহার শ্রেষ্ঠতা হইতে আমরা উপকৃত হই তিনিই ভক্তির পাত্র (১০ম অধ্যায়)।” “মনুষ্য মধ্যে কে ভক্তির পাত্র ?···পিতামাতা ভক্তির

৩৪। বঙ্গদেশের কৃষক : বিবিধ প্রবন্ধ পৃ: ২৬২—২৬৩, সাহিত্য পরিষৎ শতবার্ষিকী সংস্করণ।

পাত্র। তাঁহারা যে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা বুঝাইতে হবে না (ঐ)।" শ্রেষ্ঠ শব্দটি যদি তুলনামূলক হয় ও তার গুণগত ভিত্তি থাকে তবে এ বিবৃতি সর্বদা সত্য হতে পারে না। প্রহ্লাদের চেয়ে হিরণ্যকশিপু ভক্তি-গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। কিন্তু বিস্তৃত বিচার ক্ষান্ত রেখে বঙ্কিমের মতানুসরণ করা যাক "(২) গুরু জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ আমাদের জ্ঞানদাতা এজন্য তিনিও ভক্তির পাত্র। (৩) স্বামী সকল বিষয়েই স্ত্রীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি ভক্তির পাত্র" পুনশ্চ, ভক্তির বিপরীত ভাব হিসেবে তিনি ঘৃণার উল্লেখ করেন। ঘৃণা এবং ভক্তি ব্যতীত অপর কোন ভাব, কোন মানসিক সাম্যাবস্থা যে সম্ভব যা থেকে সদর্থক বিচারশীলতা আসে, এ চেতনা-ই তাঁর মধ্যে অনুপস্থিত। এবং "গৃহস্থ পরিবারের যে গঠন সমাজের সেই গঠন। গৃহের কর্তার ন্যায় রাজা সেই সমাজের শিরোভাগ। রাজাকে সমাজের পিতার স্বরূপ ভক্তি করিবে। ...যেখানে রাজভক্তি আছে—যথা জার্মানি বা ইতালি সেখানে রাজ্য উন্নতিশীল (ঐ)।" এই অগণতান্ত্রিক পক্ষপাত লক্ষণীয়। এরও শর্ত বর্তমান, "রাজা যতক্ষণ প্রজাপালক, ততক্ষণ তিনি রাজা, যখন তিনি প্রজাপীড়ক হইলেন তখন তিনি আর রাজা নহেন। আর ভক্তির পাত্র নহেন (১০ম অধ্যায়)।" কিন্তু পিতৃবৎ ভক্তির সংগে রাজার কার্যাবলীর বিচারের এবং তাঁকে সুশাসনে বাধ্য করার বাস্তব ও নৈতিক সামঞ্জস্যবিধান হবে কোন উপায়ে? রুশোর *social contract* ও *general will*-এর সংগে হেগেলের *absolute state* ও *real will*-এর সমন্বয় সম্ভব কোন পথে? এ প্রশ্নের উত্তর দেবার দায়িত্ব ধর্ম্মতত্ত্বের গুরুর ছিলনা, কারণ রাজনীতি তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার সীমাবহির্ভূত। এই জাতীয় পরস্পর-বিরোধী উক্তি আমাদের বিশিষ্ট মধ্যবিত্ত মানসিকতার লক্ষণ। কোন মতাদর্শের-ই প্রকৃত তাৎপর্য্য ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্তের অভিজ্ঞতা ও চেতনার অতীত। ফলে উভয়ের-ই মৌখিক স্বীকৃতির দ্বারা তাঁদের ধারণা হয় যে তাঁরা উভয়ের-ই সমন্বয়-সাধনে সমর্থ। কার্যত প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের মতামতের কোন অভিজ্ঞতাসম্মত ভিত্তি নেই কোথাও।

পুনশ্চ "রাজার অপেক্ষাও যাহারা সমাজের শিক্ষক তাঁহারা ভক্তির পাত্র।...সমাজ ব্রাহ্মণকে এত ভক্তি করিত বলিয়াই, ভারতবর্ষ অল্পকালে এত উন্নত হইয়াছিল। সমাজ শিক্ষাদাতাদিগের সম্পূর্ণ বশবর্তী হইয়াছিল বলিয়াই সহজে উন্নতি লাভ করিয়াছিল (ঐ)।" সাম্যের বিচার সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হল ধর্ম্মতত্ত্বে। ভারতবর্ষের অবনতির কারণ পরে উন্নতির কারণ বলে নির্দিষ্ট হল। সুতরাং অধিকার-সচেতনতা, দ্বন্দ্ব ও স্বাধীনতা নয়, আজ্ঞানুবর্তিতা ও বশবর্তিতা প্রয়োজন, কারণ তা না হলে "সমাজে ঐক্য থাকে না, বন্ধন থাকে না, উন্নতি ঘটে না।" সমাজ অর্থে তিনি যে সমাজ-ব্যবস্থার সংগে পরিচিত সেই সমাজ। বঙ্কিমের মত পরিবর্ত্তনের কার্য-কারণ আজো সম্যক নির্ণীত হয় নি, কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্বের উক্ত অধ্যায় থেকে-ই তাঁর পরিবর্তিত মতের উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। চাকুরীজীবী ও নতুন ভাবাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত যুবকদের অভ্যুদয়ের সংগে সংগে প্রাচীন পারিবারিক ব্যবস্থা ও তার নৈতিক মানের ভাঙন, রাজশক্তির সংগে বিবর্দ্ধমান কলহের উত্তেজনায় সঞ্চারিত তাপ, প্রতিষ্ঠিত সমাজপতিদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্দ্ধমান ক্ষোভ, তাঁকে সম্ভাব্য বিপ্লব সম্বন্ধে ভীত ও অশান্ত করে তোলে: "গৃহ নরক হইয়া উঠিতেছে, রাজনৈতিক ভেদ ঘটিতেছে, শিক্ষা অনিষ্টকারী হইতেছে, সমাজ অনুন্নত ও বিশৃঙ্খল রহিয়াছে৩৫" এই উক্তি অতি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদিগ্ধ, কিন্তু এর উৎস সন্ধানে তিনি যৌবনের দৃষ্টি নিয়ে সমাজের গতিপ্রকৃতির বাস্তব কার্যকারণ সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন না। কর্তৃস্থানীয়দের প্রতি আনুগত্য (তার পরিভাষায় ভক্তি) একমাত্র অবলম্বন হিসেবে নির্দেশ করে লোকাতীত রাজ্যে সান্ত্বনার আশ্রয় খুঁজলেন শুধু। প্রশ্ন করলেন না, যে কোন ঐতিহাসিক কারণে উনিশ শতকের বাংলায় প্রাচীনের প্রতি আনুগত্যের নৈতিক মূল শিথিল হয়েছিল। বঙ্কিমের ভাষাতেই অবশ্য এর কারণ নির্দেশ করা চলে। বঙ্কিমের ভ্রমরের মত-ই নবযুগের বাংলা রাজশক্তি ও সমাজশক্তিকে বলেছিল: "যতদিন তুমি আমার ভক্তির যোগ্য ততদিন আমার ভক্তি।"

৩৫। ধর্ম্মতত্ত্ব: ১০ম অধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র ও শাস্ত্র

হিন্দুত্ব যে বঙ্কিমের ধারণায় জাতীয়তার আধার ও কেন্দ্র হিসেবে-ই বিশেষ মূল্য অর্জন করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি কোনদিনই শাস্ত্রের অভ্রান্ততায় সম্মতি জ্ঞাপন করেন নি—কখন-ই শাস্ত্রকে বা সাংখ্যের শব্দকে প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করে নেন নি। এ বিষয়ে তাঁর চিন্তার দৃঢ় ঋজুতা একমাত্র অক্ষয় কুমার দত্তের সংগে তুলনীয়। পরিণত বয়সে প্রচারের প্রথম বর্ষে তিনি প্রশ্ন করেনঃ "হিন্দুধর্ম্মের কোন কথা সত্য, কোন কথা মিথ্যা তাহার মীমাংসা কে করিবে—কোনটুকু ধর্ম্ম কোনটুকু ধর্ম্ম নয়? উত্তর আমাদেরই তাহার মীমাংসা করিতে হইবে। **সত্যের লক্ষণ আছে।** যেখানে সেই লক্ষণ দেখিব **সেইখানে ধর্ম্ম** বলিয়া স্বীকার করিব..."। (বড় অক্ষর আমার)

সত্যনির্দ্ধারণের জন্য তিনি ব্যক্তিবিবেচনা-সম্মত যুক্তি, বুদ্ধি বা তদনুরূপ কোন বাস্তব মানের ওপর নির্ভর করেছেন অন্য কিছুর উপর নয়। এইখানে-ই নবযুগের বাংলার সংগে বঙ্কিমচন্দ্রের যোগ। বস্তুত ঈশ্বরজ্ঞান-ই একমাত্র জ্ঞান বলে যাঁরা প্রচার করেন বর্ত্তমানকালে তাঁদের প্রভাব উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হলেও নবযুগের বাংলায় তাঁরা উপেক্ষিত-ই হয়েছিলেন। কিন্তু সত্যনির্ণয়ের এই পন্থানির্দেশ করলেও অক্ষয় দত্তের মত "পরমেশ্বর নির্ম্মিত অভ্রান্ত গ্রন্থ" ও "তদীয় নিয়ম" আলোচনায় বঙ্কিম আত্মনিয়োগ করলেন না—বস্তুতঃ সত্যানুসন্ধানও তাঁর লক্ষ্য নয়, "প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম নিরূপনই" তাঁর লক্ষ্য কারণ, "যে সমাজ ধর্ম্মশূন্য তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।" সুতরাং বঙ্কিম ঘোষণা করলেন, "আগে দেখিতে হইবে হিন্দু শাস্ত্রে কি আছে।"

শাস্ত্র মানা না-মানার বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা যে নীতির দিক থেকে শেষ যুগেও দ্বিধাহীন ও ঋজু ছিল, সেই প্রসঙ্গে কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেবকে লিখিত একটি চিঠি প্রাসঙ্গিক জ্ঞানে অংশত উদ্ধৃত করি। চিঠিটির মূল্য এই কারণে আরো অধিক যে, এতে তিনি স্বয়ং বহুবিবাহ নিরোধ সম্পর্কে

বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁর বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করেছিলেন ৩৬। বিদেশ গমন যে হিন্দু শাস্ত্রসম্মত সেই কথা প্রমাণে উদ্যোগী হয়ে রাজা বিনয়কৃষ্ণ বঙ্কিমের সমর্থন প্রার্থনা করে পত্র দেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তর প্রকাশিত হয় হিতবাদী পত্রিকায় ১৮৯২, ২৭শে জুলাই। বঙ্কিম বলেন ঃ "প্রথমতঃ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন প্রকার সমাজ সংস্কার সম্পন্ন হইতে পারে,

৩৬। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শাস্ত্র-বিচারের নৈতিক কারণ পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি। বহুবিবাহ সম্পর্কে বঙ্কিমের মতও তিনি তত্ত্ব ও তথ্যের সাহায্যে সম্পূর্ণ খণ্ডন করেন। তিনি বলেন, "এক্ষণে কুলীনদিগের পূর্ব্ববৎ অত্যাচার নাই এই নির্দ্দেশ সম্পূর্ণ প্রতারণা বাক্য"। অতঃপর বাকবিস্তারে অনীহা প্রকাশ করে তিনি তথ্যপঞ্জী পেশ করেন। তিনি তার জানিত ১৩৩ জন কুলীন ব্রাহ্মণের নাম ও নিবাস মুদ্রিত করেন যারা সবসাকুল্যে ১৪৭৩টি বিবাহ করেছিল! এদের মধ্যে এক সার্থক নামা ভোলানাথ, হ্যাঁ, ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একাই ৮০টি বিবাহ করে। শুধু জনাই গ্রামে-ই বিদ্যাসাগর উল্লেখ করেন যে, ৬৪ জন কুলীন ব্রাহ্মণ ১৬২টি বিবাহ করেছে। ঐ গ্রামে কোন কোন কুলীন ১০টি বিবাহ করেছিল।

এই ভয়ংকর ও হৃদয়-বিদারক তথ্যপঞ্জী পেশ করে সমাজ-সচেতন বিদ্যাসাগর নব্যহিন্দুদের সতর্ক করে দেন, "কলিকাতাবাসী নব্যসম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক পল্লীগ্রামের কোনও সংবাদ রাখেন না, সুতরাং তত্রত্য যাবতীয় বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, কিন্তু তৎসংক্রান্ত কোনও বিষয়ে অভিপ্রায় প্রকাশের প্রয়োজন হইলে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞের ন্যায় অসঙ্কুচিত চিত্তে তাহা করিয়া থাকেন। তাঁহারা কলিকাতার ভাবভঙ্গী দেখিয়া, তদনুসারে পল্লীগ্রামের অবস্থা অনুমান করিয়া লয়েন। ঐসকল মহোদয়েরা বলেন, এদেশে বিদ্যার সবিশেষ চর্চা হওয়াতে, বহু বিবাহাদি কুপ্রথার প্রায় নিবৃত্তি হইয়াছে।............

.........সবিশেষ অনুসন্ধান ব্যতিরেকে কেহ কোনও বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হইতে পারেন না। বহু বিবাহ প্রথা বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করিলে, ঐ জঘন্য ও নৃশংস প্রথা অনেক নিবৃত্তি হইয়াছে, উহা আর পূর্ব্বের মত প্রবল নাই, পরপ্রতারণা যাহার উদ্দেশ্য নহে তাদৃশ ব্যক্তি কদাচ এরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারে না।" (বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না, এতদ্বিষয়ক বিচার, দ্বিতীয় পুস্তক, (১লা এপ্রিল ১৮৭৩)—বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী-সমাজ, পৃঃ ২৩২—২৪২, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ)।

অথবা সম্পন্ন করা উচিত, আমি এমন বিশ্বাস করি না। যখন মৃত মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ নিবারণ জন্য শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন তখনও আমি এই আপত্তি করিয়াছিলাম এবং এখনও পর্যন্ত সে মত পরিবর্তন করার কোন কারণ আমি দেখি নাই। আমার এরূপ বিবেচনা করিবার দুইটি কারণ আছে। প্রথম এই যে বাঙ্গালী সমাজ শাস্ত্রের বশীভূত নহে—দেশাচার বা লোকাচারের বশীভূত। যেখানে লোকাচার এবং শাস্ত্রে বিরোধ, সেখানে লোকাচারই প্রবল ৩৭।" এই বিবৃতি থেকে বোঝা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্র কেন মনে করতেন যে, "শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন প্রকার সমাজ সংস্কার সম্পন্ন হইতে পারে না।" তাঁর এই উক্তি অবশ্য ইতিহাস-সম্মত নয়। কারণ রামমোহনও শাস্ত্র-প্রমাণের সাহায্যে-ই সতীদাহ প্রথার নিরোধ সম্ভব করেছিলেন। কিন্তু শাস্ত্র-প্রমাণের সাহায্যে কোন প্রকার সমাজ সংস্কার করা কেন

৩৭। বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে বিদ্যাসাগরকে হিন্দু সমাজে লোকাচারের স্থান সম্বন্ধে জ্ঞানদানের চেষ্টা অতি আশ্চর্য কাজ হয়েছিল সন্দেহ নেই। লোকাচার বা দেশাচার সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের উক্তি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। "ধন্যরে দেশাচার! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে দুর্ভেদ্য দাসত্ব শৃঙ্খলে বাধিয়া কি একাধিপত্য করিতেছিস। তুই ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া, শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস, ধর্ম্মের মর্ম্মভেদ করিয়াছিস, হিতাহিত বোধের গতিরোধ করিয়াছিস, ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস। তোর প্রভাবে শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে; ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে, অধর্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া মান্য হইতেছে। সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃত, যথেচ্ছাচারী দুরাচারেরাও তোর অনুগত থাকিয়া কেবল লৌকিক রক্ষাগুণে গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে আর দোষস্পর্শশূন্য প্রকৃত সাধু পুরুষেরাও তোর অনুগত না হইয়া কেবল লৌকিক রক্ষায় অযত্ন প্রকাশ ও অনাদর প্রকাশ করিলেই সর্ব্বত্র নাস্তিকের শেষ, অধার্ম্মিকের শেষ সর্ব্বদোষে দোষীর শেষ বলিয়া গণণীয় ও নিন্দনীয় হইতেছে।

(বিধবাবিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তক, (অক্টোবর, ১৮৮৫) বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী-সমাজ, পৃঃ ১৮৫, ঐ)। বঙ্কিম বিদ্যাসাগরকে সমাজে লোকাচারের স্থান সম্বন্ধে অবহিত করার সতেরো বৎসর পূর্ব্বে ১৮৫৫-তে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

অনুচিত, এ বিষয়ে কোনও কারণ উপরোক্ত বিবৃতি থেকে পাওয়া যায় না। কারণ লোকাচারের অস্তিত্ব একটি ঘটনা মাত্র। শাস্ত্র-প্রমাণের সাহায্যে তার বিরোধিতা অকর্তব্য কেন, এই প্রশ্ন স্বভাবত-ই মনে আসে। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যঃ "সমাজ সর্বত্র শাস্ত্রের বিধানানুসারে চলিলে সামাজিক মঙ্গল ঘটিবে কিনা সন্দেহ। সকল বিষয়েই কি সমাজকে শাস্ত্রের বিধানানুসারে চলিতে বলিতে সাহস করিবেন? ধর্মশাস্ত্রের একটি বিধি এই যে ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণের পরিচর্যাই শূদ্রের ধর্ম। বাংলার শূদ্রেরা কি সেই ধর্মাবলম্বী? শাস্ত্রের ব্যবস্থা এখানে চলে না···। হাইকোর্টের শূদ্র জজ জজিয়তি ছাড়িয়া, বা সৌভাগ্যশালী শূদ্র জমিদার জমিদারের আসন ছাড়িয়া ধর্মশাস্ত্রের গৌরবার্থে লুচিভাজা ব্রাহ্মণের পদ সেবায় নিযুক্ত হইবেন কি? কোন মতেই না।। বাঙ্গালী সমাজ, প্রযোজন মতে ধর্মের কিয়দংশ মানে প্রয়োজনমতে অবশিষ্টাংশ অনেককাল বিসর্জন দিয়াছে।" এই প্রয়োজনের স্বরূপ কি তা অবশ্য তিনি বলেননি। তাঁর বিবৃতি থেকে অনুমান করে নিতে পারি যে, প্রাচীন প্রথাগত সমাজের তুলনায় নতুন শ্রেণী-বিন্যস্ত সমাজের প্রয়োজনের কথাই উল্লেখ করেছেন তিনি। "···এমন স্থলে ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা খুঁজিয়া কি ফল? আমার নিজের বিশ্বাস যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে এবং নীতি সম্বন্ধে সামাজিক উন্নতি (Religious & moral regeneration) না ঘটিলে, কেবল শাস্ত্রের বা গ্রন্থবিশেষের দোহাই দিয়া সামাজিক প্রথা বিশেষ পরিবর্তন করা যায় না। সমাজ দেশাচারের অধীন নহে। এই দেশাচার পরিবর্তন জন্য ধর্ম সম্বন্ধীয় এবং নীতি সম্বন্ধীয় সাধারণ উন্নতি ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই উন্নতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে, (সমুদ্রযাত্রায়) কাহারও কোন আপত্তি থাকিবে না, কাহারও থাকিলেও সে আপত্তির কোন বল থাকিবে না"।

"···আমার এই বক্তব্য সমুদ্রযাত্রা হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রনুমোদিত কি না তাহা বিচার করিবার আগে দেখিতে হয় যে, ইহা ধর্ম্মানুমোদিত কি না? যাহা ধর্ম্মানুমোদিত কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ, তাহা কি ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া পরিহার্য্য? অনেকে বলিবেন যে যাহা ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত,

তাহাই ধর্ম্ম, যাহা হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ, তাহাই অধর্ম্ম, এ কথা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। হিন্দুদিগের প্রাচীন গ্রন্থে এইরূপ পাই না। মহাভারতে কৃষ্ণোক্তিঃ ধর্ম্ম লোক সকলকে ধারণ (রক্ষা) করেন এই রূপ আছে।"

"এই জন্য ধর্ম্ম বলে, যাহা হইতে লোকের রক্ষা হয়, ইহাই ধর্ম্ম নিশ্চিত জানিবে। যদি মহাভারতকার মিথ্যা না বলিয়া থাকেন, যদি হিন্দুদিগের আরাধ্য ঈশ্বরাবতার বলিয়া সমাজে পূজিত কৃষ্ণ মিথ্যাবাদী না হন তবে যাহা লোকহিতকর তাহাই ধর্ম। সমুদ্রযাত্রা যদি লোকহিতকর হয় তবে ইহা স্মৃতিশাস্ত্র বিরুদ্ধ হইলেও কেন জাতি ত্যাগ করিব?"

প্রাচীন গ্রন্থের উল্লেখে ও শাস্ত্রপ্রমাণ সংগ্রহের মধ্যে যে স্ব-বিরোধিতা ঘটেছে সেটা তাঁর চৈতন্যকে স্পর্শ করেনি। মহাভারতে উক্তি কৃষ্ণোক্তি যদি সত্য না হয়ে পারে না, তাহলে অন্যান্য শাস্ত্রোক্তি সম্বন্ধেও সেই এক-ই দাবী করা চলে।

আরো লক্ষণীয় এই যে ধর্মের যে, সংজ্ঞা তিনি উপস্থিত করেছেন তা লৌকিক; স্পষ্টত-ই উনিশ শতকের *utilitarian*-দের মতাদর্শ থেকে গৃহীত। অথচ তার প্রতিষ্ঠাকল্পে নিছক মানবিক যুক্তির উপর নির্ভর না করে স্ব-নিন্দিত 'শাস্ত্রের দোহাই' দিতে হয়েছে তাঁকে। ধর্ম্মের সংজ্ঞা-নির্ণয়ে শাস্ত্রের উক্তিকে শেষ পর্যন্ত প্রামাণ্য বলে স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি, যদিও তাঁর ধর্মের ধারণা শাস্ত্র থেকে সংগৃহীত হয়নি। এই স্ব-বিরোধ তাঁকে নিয়ে গেছে গভীরতর বিপর্যয়ের পথে। শাস্ত্রোক্তি সম্বন্ধে এই দুর্ব্বলতার মূল নিহিত রয়েছে তাঁর স্বকীয় সংস্কারে, এবং শেষ পর্যন্ত হিন্দুত্ব ও উনিশ শতকের সমাজ-দর্শনের তৎকৃত সমন্বয়ে সেই সংস্কার-ই জয়ী হয়েছে অতি বিচিত্র ভাবে।

..."আমি এইরূপ বুঝি ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহাই আছে তাহাই হিন্দুধর্ম্ম নহে। হিন্দুধর্ম্ম অতিশয় উদার। স্মার্ত্ত ঋষিদিগের হাতে—বিশেষতঃ আধুনিক স্মার্ত্ত রঘুনন্দনাদির হাতে ইহা অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। স্মার্ত্ত ঋষিগণ হিন্দুধর্ম্মের স্রষ্টা নহেন—হিন্দুধর্ম্ম সনাতন—তাঁহারদিগে পূর্ব্ব হইতেই আছে। অতএব সনাতন ধর্ম্মে এবং এই ধর্ম্মশাস্ত্রে বিরোধ

অসম্ভব নহে।" তাঁর বর্ণিত 'সনাতন ধর্ম্মের' ভিত্তি কি? তাঁর নিজস্ব যুক্তি-বুদ্ধি? লোকহিত সম্বন্ধে তাঁর উনিশশতকীয় ধারণা? তাই যদি হয়, তাহলে তা সনাতন কি হিসেবে? শাস্ত্রকে না মেনে শুধু নিজের সুবিধা অনুযায়ী শাস্ত্রের কিছু কিছু বচন উদ্ধার করে কোনও একটি মতবিশেষকে সনাতন বলে দাবী করার মধ্যে যৌক্তিকতা না ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠা কোথায়? তিনি যাকে সনাতন বলে চালু করতে উদ্যত ঐতিহাসিক বিচারে কি সেইটা-ই সনাতন? এসব প্রশ্নের উত্তরকল্পে যে আত্মবিচারের প্রয়োজন বঙ্কিমচন্দ্রে তা অনুপস্থিত। তাঁর ধারণা বা সংস্কার তথা অনুমান-ই তাঁর কাছে প্রমাণ। কি ভাবে তা দেখা যাক।

......"যেখানে (সনাতনধর্ম্মে এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে) এইরূপ বিরোধ দেখিব, সেখানে সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত। ধর্ম্মে এবং হিন্দুধর্ম্মে কোন বিরোধ আমি স্বীকার করতে পারি না।" কেন? না পারার কারণ কি? কারণ তাঁর সংস্কার, "...ধর্ম্মের সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের যদি কোন বিরোধ থাকে তবে হিন্দুধর্ম্মের গৌরব কি? উহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলিব কেন? এরূপ বিরোধ নাই।" এই বিশ্বাসের ঘোষণায় সমস্ত দার্শনিক ও ঐতিহাসিক মীমাংসা নিষ্পন্ন হয়ে গেল। অতএব, "সমুদ্রযাত্রা লোকহিতকর বলিয়া ধর্ম্মানুমোদিত।" সুতরাং... "..ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহাই থাকুক, সমুদ্রযাত্রা হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত।" হিন্দুধর্মের গৌরব আছে, অতএব হিন্দুধর্মে ও তাঁর কল্পিত সনাতন ধর্মে বিরোধ অসম্ভব। বৃত্তাকার যুক্তি বা circular logic বলে এই অপূর্ব সিদ্ধান্তের অনুশীলন করে অগত্যা স্বীকার করতে হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের মূল্যবোধের ভিত্তি *utilitarianism*, যার সঙ্গে বর্ণ-বিভক্ত হিন্দুত্বের সম্পর্ক সামান্যই, অথচ এই বাস্তব সত্যকে স্বীকার করা তাঁর সংস্কারের পরিপন্থী। ফলে, তাঁর উদ্যম নিয়োজিত হয়েছে এই দুই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তার ঐক্যপ্রমাণ-সংগ্রহে ও প্রয়াসে। এবং যেহেতু এই প্রমাণ-প্রচেষ্টার ভিত্তি সংস্কার বা সংস্কারভিত্তিক জাতীয়তা, সেইহেতু শেষ পর্যন্ত প্রমাণের আবশ্যকতাও দূরীভূত হয়েছে। সংস্কার সরাসরি আত্মপ্রকাশ করেছে, যা হিন্দুধর্মাশ্রিত

তা যে লোকহিতকর, একথা বাস্তবত প্রমাণ করার দায়িত্ব এড়িয়ে, যা লোকহিতকর তাকেই হিন্দুধর্ম বলে অনৈতিহাসিক ঘোষণা করে, অবাস্তব আত্মপ্রসাদে পুলকিত হয়েছেন তিনি। স্মরণ রাখেন নি যে, মহাভারতের যে একটি শ্লোককে তিনি হিন্দুধর্মের মূল বলে বিজ্ঞাপন করেছেন, তার বিরোধী শ্লোকও হিন্দুশাস্ত্রে আছে। সেই শ্লোকটির যে ব্যাখ্যা তাঁর ইংরেজি শিক্ষিত উনিশশতকীয় মনে প্রতিভাত হয়েছিল, সেইটা-ই তার একমাত্র ব্যাখ্যা নয়। বস্তুত যে কোন ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি স্বীকার করবেন যে, উপরোক্ত শ্লোকটি সহজে-ই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম তথা জাতিভেদের সমর্থনকল্পে প্রয়োগ করা যায় এবং এদেশে চিরকাল তা সেইভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। সর্বোপরি, লোকহিত শব্দটি ধারণায় যে স্পষ্টতা-ই অর্জন করে থাকুক, সামাজিক জীবনে কোনটি লোকহিতকর, সে বিষয়ে গণতন্ত্রী এবং অগণতন্ত্রী ধারণার বিরোধ-ই মুখ্য। বর্ণাশ্রমধর্মীর বিবেচনায় বর্ণাশ্রমধর্মের রক্ষণে-ই সমাজ রক্ষা হয়, তথা লোকহিত ঘটে। অন্যপক্ষে গণতন্ত্রী মানুষের বিবেচনায় প্রত্যেকের অধিকারসাম্য প্রতিষ্ঠাতে-ই, লোকহিতের ভিত্তি রচিত হয়। সুতরাং হিন্দুধর্মে লোকহিতের তত্ত্বগত ধারণা উপস্থিত এ কথা প্রমাণ করলেও মূল প্রতিপাদ্য অপ্রমাণিত থাকে, যদি না সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ করা যায় যে, হিন্দুধর্মের বিধানে সামাজিক জীবনে অধিকারী-ভেদ অনুপস্থিত এবং প্রত্যেক মানুষের মূল্য ও মর্য্যাদা হিন্দুবিধানে সমান বলে স্বীকৃত। আর সে প্রমাণ-প্রতিষ্ঠা বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে শুধু নয়, কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। কারণ অধিকারীভেদ ও বর্ণাশ্রম, হিন্দুতত্ত্ব ও সমাজচিন্তার ভিত্তি। এই কারণেই হিন্দুধর্ম এবং লোকহিত এক নয়। বাস্তবে তা হয়ও নি—কোটি কোটি অস্পৃশ্য-ই তার প্রমাণ। যা বাস্তবিক অসত্য, কেবল সংস্কারের তাড়নায় তার প্রমাণ-কল্পে তাঁর অপরিমিত বুদ্ধিশক্তি ব্যয়িত হয়েছিল বলে-ই কালের ব্যবধানে তাঁর মতামত এত চিহ্নিত মনে হয়। যুক্তিবিচারের দ্বারা সংস্কারের সত্যনির্ণয় না করে,—সংস্কারের সমর্থনকল্পে যুক্তিবিচারের ব্যবহার ঘটেছিল বলে-ই বঙ্কিমকে শেষ পর্যন্ত যুক্তিবাদী বলা চলে না।

তাঁর যুক্তিপরায়ণ মানস আজ অনুসন্ধানের সামগ্রী। তাঁর সিদ্ধান্তসমূহের ভিত্তি তাঁর সংস্কার—যুক্তি ও বিচার নয়। যুক্তি সর্বত্র প্রযুক্ত হয়েছে যুক্তিহীনতার সমর্থনে, যুক্তিহীনভাবে।

এই কারণেই অক্ষয় দত্তের রচনায় শেষকালে যে দার্শনিক ঋজুতা উপস্থিত, বঙ্কিমে তা শেষত কোথাও দৃশ্যগোচর হয় না।

যা চোখে পড়ে তা হয়কে নয় করার প্রয়াস এবং নয়কে হয় করার প্রচেষ্টা।

২

সৃজনশীল চিন্তানায়ক হিসেবে বঙ্কিমের শাস্ত্রালোচনা অবশ্য যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়েছিল। শাস্ত্র সম্বন্ধে বঙ্কিমের আগ্রহের ফল একদিকে দেবতত্ত্ব সম্পর্কে অপূর্ব প্রবন্ধসমষ্টি, অন্যদিকে কৃষ্ণ-চরিত্র ও ধর্ম্মতত্ত্ব। এই আলোচনার দ্বারা তিনি প্রকৃত হিন্দুধর্মকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন কিনা তার বিচারক আমি নই। তবু বহিরঙ্গ বিচারেও মনে হয়, পারেন নি। তিনি হিন্দুধর্মের একটি ব্যাখ্যা দেন যার প্রভাবে দেশের হিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকের ধারণা জন্মায় যে, হিন্দুধর্ম অযৌক্তিক তো নয়ই বরং পশ্চিমে প্রচলিত বিবিধ মতাদর্শের তুলনায় শ্রেয়। সেদিক দিয়ে তাঁর চেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হয়নি। কিন্তু তাঁর বিচারের পদ্ধতি ও পরিণাম সম্বন্ধে আলোচনার অবকাশ আছে, কারণ প্রথমটি ত্রুটিশূন্য নয় এবং দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণ শুভ হয়নি।

প্রথমত হিন্দুত্ব কি, এই সত্যনির্ণয়ের জন্যে এবং হিন্দুত্বের উৎকর্ষ প্রমাণের জন্যে শাস্ত্র-বিচারে অবতীর্ণ হওয়াটা-ই তাঁর পক্ষে সঙ্গত হয়নি। কেন হয়নি, তার কারণ তিনি নিজেই বিদ্যাসাগরের বিরোধিতা প্রসংগে উল্লেখ করেন। হিন্দুত্বের প্রাণ কোন শাস্ত্রে নেই। হিন্দুত্ব জীবিত রয়েছে হিন্দুর জীবনযাত্রায়, অথবা লোকাচারে। সুতরাং লোকাচারকে পরিবর্তন বা সমালোচনা না করে যদি শাস্ত্রবচন থেকে হিন্দুত্বের উৎকর্ষ প্রমাণ করা হয়, তাহলে তার দ্বারা হিন্দুত্বের উৎকর্ষ প্রমাণিত হবে না, হবে শাস্ত্রকারদের বুদ্ধি বা হৃদয়বৃত্তির উৎকর্ষের প্রমাণ। এই চেষ্টার

সামাজিক পরিণাম যে কেন শুভ নয় তা ক্রমশ প্রকাশ্য। এই পদ্ধতির দ্বিতীয় যে ত্রুটি, তা বঙ্কিম স্বয়ং উল্লেখ করেন রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসংগে। যথা, "কোন পদার্থের অংশকে সেই পদার্থ কল্পনা করায় সত্যের বিঘ্ন হয়। অংশমাত্র গ্রহণ করিয়া সকল পদার্থেরই প্রশংসা করা যায়। রাজনারায়ণ বাবু হিন্দুধর্ম্মের অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়া ঐ ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়াছেন, তেমনি ঐ ধর্ম্মের অপরাংশ গ্রহণ করিয়া তাঁহার সকল কথাই খণ্ডন করা যাইতে পারে। যেমন অঙ্গুরীয়মধ্যস্থ হীরককে অঙ্গুরীয় বলা যায় না তেমনি কেবল ব্রহ্মোপসনাকে হিন্দুধর্ম্ম বলা যায় না। যেমন কলিকাতাকে ভারতবর্ষ বলা যায় না, তেমনি কেবল ব্রহ্মোপাসনাকে হিন্দুধর্ম্ম বলা যায় না।" ৩৮

অনুরূপভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন ধর্মকেও হিন্দুধর্ম বলা যায় না। অনুশীলনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হলেও (যদি মেনে নেওয়া যায় যে তা প্রমাণিত হয়েছে) তার ফলে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়, হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয় না।

এবং এই চেষ্টার পরিণাম একাধিক কারণে সম্পূর্ণ সুফলপ্রদ হয়নি। প্রথমত, উনিশ শতকের বিজ্ঞান-কেন্দ্রিক দর্শনের সংগে তুলনায় পুনঃপুনঃ হিন্দুত্বের কল্পিত শ্রেষ্ঠত্বের জয় ঘোষণায় এই ধারণা-ই জয়ী হয় যে, হিন্দুত্বের সংস্কার নিষ্প্রয়োজন, হিন্দুত্ব সুসম্পূর্ণ। এই ধারণা দৃঢ় হয় আরো এই কারণে যে, হিন্দুগৌরবের আলোচনায় লোকাচারের গ্লানির বিষয় উল্লেখ মাত্র করা হয়নি। যখন উল্লেখ করা হয়েছে তখন, 'আচার হিন্দুধর্ম্মই নয়—প্রক্ষিপ্ত মাত্র' এইভাবে নস্যাৎ করা হয়েছে। এতে আচার মরেনি। বরং জ্ঞাতি-গৌরবে ধন্য অপদার্থ পুঙ্গবের মত হিন্দুশাস্ত্র-গৌরবে ধন্য ঐতিহ্যবিরোধী হিন্দু আচার, হিন্দুত্বের গরিমায় বাংলার মানসকে আচ্ছন্ন করে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে জাতিভেদ ইত্যাদি

৩৮। বিবিধ, পৃঃ ৩১২, সাহিত্য পরিষৎ শতবার্ষিকী সংস্করণ।

হিন্দু আচার যে আশ্চর্য ঔদ্ধত্যের সংগে স্বাদেশিকতার নামে দেশবাসীর জীবন ও চিন্তা শৃংখলিত করতে উদ্যত হয়েছিল, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল যে ব্যাধিতে ভুগেছিলেন, তার মূল এই ত্রুটিপূর্ণ বিচারের গভীরে নিহিত।

দ্বিতীয়ত, হিন্দুধর্মের নিজস্ব যে ঐশ্বর্য, তার আত্মিক সম্পদ, তাও এই বিচারের ধারায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লৌকিক হিন্দুধর্মের তুচ্ছ তুচ্ছ বিধানগুলি সব-ই বিজ্ঞান-সম্মত, এবং আধুনিক বিজ্ঞান হিন্দুশাস্ত্রের অতিরিক্ত কিছুই আবিষ্কার করতে পারেনি, এই মত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এ-দেশে বিজ্ঞানের ওপর যে অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়, তাতে বিজ্ঞানের ক্ষতি হয়নি, যত ক্ষতি হয়েছিল দেশের, সমাজের ও হিন্দু আদর্শের। উদ্ভব হয়েছিল শশধর তর্কচূড়ামণির মত বিশুদ্ধ ভ্রান্তিজীবীর। চন্দ্রনাথ বসুর মত বাকসর্বস্ব যুক্তিহীনের। হাঁচিতে বিদ্যুৎ, টিকিতে ম্যাগনেটিজম আবিষ্কার ও ব্যাখ্যা করে অথবা সর্ববিষয়ে তত্ত্ব আবিষ্কার করে, যাঁরা বিজ্ঞান-বুদ্ধিহীন তৎকালীন শিক্ষিত হিন্দুর সমাজ-বিধান সম্বন্ধে অসন্তোষ দূর করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সফলও হয়েছিলেন বহুলাংশে। স্মরণ রাখতে হবে যে, বঙ্কিম স্বয়ং প্রথমে শশধর তর্কচূড়ামণিকে সমর্থন করেছিলেন। এইসব প্রচেষ্টার ফলে ধর্মের নৈতিক অঙ্গটি সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ত যদি না সেই একই সময়ে বিবেকানন্দর মত প্রতিভার উদয়ে দেশের মানুষ কিছু কাণ্ডজ্ঞানসম্মত কথা শুনত। (দ্রষ্টব্য ঃ বিবেকানন্দের 'ভাববার কথা')। কিন্তু বিবেকানন্দের প্রভাব অনুভূত হতে থাকে উনিশ শতকের শেষ দশকের শেষভাগ থেকে। এবং তা প্রথম থেকে মূলত যুবকদের মধ্যে-ই সীমাবদ্ধ ছিল। তার পূর্ব পর্যন্ত বঙ্কিমী হিন্দুধর্মই সমাজ-মানস আচ্ছন্ন করেছিল। প্রতিষ্ঠিত গৃহস্থরা কোনদিন-ই তার প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি। তাতে একদিকে বিজ্ঞান-বুদ্ধি ব্যাহত হয়েছিল, অন্যদিকে ধর্মের নৈতিক মূল্যও ক্ষুণ্ণ হয়েছিল বহুলাংশে।

তৃতীয়ত জাতীয়তা ও হিন্দুত্বকে সমার্থক করে ফেলার ফলে সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা ছাড়াও, সুষ্ঠু রাজনৈতিক চিন্তারও যে গুরুতর ক্ষতি হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। হিন্দুত্ব নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকার ফলে

ব্যক্তি-জীবনের নৈতিক সমস্যাগুলির ওপর যত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, সামগ্রিক জীবনের রাজনৈতিক সমস্যাগুলি ঠিক সেই পরিমাণে অবহেলিত হয়ে পড়ে। হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের রচনায় কোথাও আমরা মানুষের অধিকার সম্বন্ধে, স্বাধীন ভারতের সম্ভাব্য রাজনৈতিক কাঠামো সম্বন্ধে, বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের পারস্পরিক সম্বন্ধের বিষয়ে এবং রাষ্ট্রও সরকারের চরিত্রের বিষয়ে কোন আলোচনা পাই না। অথচ রাজনৈতিক আন্দোলনের পশ্চাতে যদি কেবল নৈতিক ভাবনা থাকে এবং রাজনৈতিক চিন্তা ও সচেতনতা যদি অনুপস্থিতির দ্বারাই লক্ষগোচর হয়, তবে তার ফলে আর যা-ই হোক রাজনৈতিক সাফল্য সুদূরপরাহত হয়। বাংলা তথা ভারতবর্ষের পরম্পরাগত রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস তাই যুবকদের অমিত আত্মত্যাগ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত এত করুণ।

সাম্য থেকে ধর্ম্মতত্ত্ব : পটভূমিকা

বঙ্গদর্শনের প্রকাশকাল (১৮৭২) থেকে ধর্ম্মতত্ত্বের প্রকাশকাল (১৮৮৮) পর্যন্ত বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের দিকে তাকালে দুটি মূল ধারা চোখে পড়ে। এক—নতুন জাতীয়তাবাদের ক্রমিক সম্প্রসার, দুই—সংস্কার আন্দোলনের ক্রমিক অবক্ষয় ; এবং এই দুই ধারার ঘাত প্রতিঘাতে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সামাজিক রক্ষণশীলতার সমীকরণ।

আমরা দেখেছি যে পূর্ববর্তী দশকে-ই এদেশের শিক্ষিত সমাজে জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত হয়। নীলদর্পণ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করার অপরাধে পাদ্রী লঙ্-এর বিচারে বিচারক স্যর মডারণ্ট্ ওয়েলস এ-দেশীয়দের সম্বন্ধে যে সব বিবিধ কটূক্তি করতে থাকেন তার প্রতিবাদে ১৮৬১, ২৬শে আগস্ট রাজা রাধাকান্ত দেবের ভবনে একটি বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। শহরের শিক্ষিত সমাজের বিভিন্ন মতাবলম্বী সমস্ত গোষ্ঠিই এতে যোগ দিয়েছিলেন। এই নীলদর্পণের মামলাকে-ই জাতীয়তাবাদের প্রথম সোপান বলা চলে। হিন্দু পেট্রিয়টে হরিশ মুখোপাধ্যায়ের রচনাগুলিও সেই জাতীয়তাবাদের নতুন রূপ দিয়েছিল। ১৮৬৭-তে হিন্দুমেলার অনুষ্ঠান একদিকে জাতীয় গৌরব, অন্যদিকে জাতীয় শিল্পের গুরুত্বকে মানুষের সামনে তুলে ধরে। ১৮৬৮-তে নীলকরদের কেন্দ্র করে অমৃতবাজারের লাইবেল মোকদ্দমাও জাতীয়তাবাদের সমস্যাকে সর্বসাধারণের সামনে স্পষ্টত উত্থাপিত করে।

পূর্ববর্তী দশকে কয়েকটি সভা, মামলা বা মেলা-র মত বাৎসরিক অনুষ্ঠানের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদের প্রতিবাদ রূপ নেয়। পরবর্তী দশকে দেখি যে, সেই প্রতিবাদ আরো সুষ্ঠু, আরো সংহতরূপে স্থায়ী সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রূপায়িত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ভারতসভা (১৮৭৬) এবং অমৃত-

বাজারের ঘোষ ভ্রাতৃবর্গের উদ্যোগে অন্য এক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান—ইনডিয়ান লীগ; রাজনারায়ণ বসু ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে সঞ্জীবনী সভা। পরবর্তী দশকে ন্যাশনাল কনফারেন্স (১৮৮৩) ও কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার (১৮৮৫) মধ্যে যে রাজনৈতিক সংগঠনের পরিচয় পাওয়া যায় এই দশকের বিভিন্ন সমিতি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই তার সূচনা চোখে পড়ে। প্রতিষ্ঠানের মতই, এই সময়েই নিরবচ্ছিন্ন রাজনৈতিক প্রচারকার্যের সূত্রপাত। আই. সি. এস.-এর প্রতিষ্ঠাচ্যুত সুরেন্দ্রনাথ ভারতসভার পক্ষে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে উত্তর ভারত পরিক্রমা করেন এবং প্রথম দেশে ব্যাপক রাজনৈতিক প্রচারকার্য চালান। ১৮৭৮-এ তিনি একই উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত পরিক্রমা করেন।

ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের ক্রমাবনতি এবং সাম্রাজ্যবাদের রীতি-নীতি ও রাষ্ট্রাদর্শের সঙ্গে ক্রমবর্দ্ধমান বিরোধও জাতীয়তাবাদের ধারাকে বেগবান করে তোলে। এই জাতীয়তাবাদের ধারা সঙ্গীত, কাব্য নাটক প্রবন্ধ কাহিনী বক্তৃতা প্রভৃতির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক জীবনের স্তরে স্তরে সঞ্চারিত হয়ে সমগ্র সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও পরিমণ্ডল রূপান্তরিত করে। দেশীয় সাধারণের সঙ্গে তাঁদের শাসনব্যবস্থার সম্পর্ক যে উত্তরোত্তর তিক্ত ও জটিল হয়ে পড়ছে, ব্রিটিশ ভারতীয় সরকার অবশ্যই সে বিষয়ে অনবহিত ছিলেন না। দেশের চতুর্দিকে পুনঃ পুনঃ দুর্ভিক্ষজনিত কৃষক শ্রেণীর যন্ত্রণা এবং রাজনৈতিক এমন কি বহুলাংশে নাগরিক অধিকারবর্জিত শিক্ষিত শ্রেণীর ক্ষোভ যে মিলিত হয়ে তাঁদের সিংহাসনের স্থায়িত্ব লুপ্ত করতে পারে, সে ভীতি তাঁদের বরাবর-ই ছিল। সেইজন্যেই ১৮৬৯ থেকে ভারত সরকার বাংলা প্রেসিডেন্সীতে উচ্চ শিক্ষার সংকোচের জন্যে স্থানীয় সরকারের ওপর চাপ দিতে থাকেন। তৎকালীন ছোটলাট সার উইলিয়াম গ্রে সে-দাবী অগ্রাহ্য করে শিক্ষিত সাধারণের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেন। পরবর্তী লেফটেনান্ট গভর্ণর সার জর্জ ক্যাম্পবেল প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের অজুহাতে উচ্চ শিক্ষার ব্যয়বরাদ্দ হ্রাস করেন। ফলে, কৃষ্ণনগর ও বহরমপুর কলেজ এবং কোলকাতার সংস্কৃত কলেজ, ডিগ্রী কলেজ থেকে ইনটার-

মিডিয়েট কলেজে রূপান্তরিত হয়। এইভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সংখ্যা হ্রাসের চেষ্টা শুরু হয়। ৪০

অথচ অসহনীয় অবস্থার দূরীকরণের জন্যে আপন স্বার্থসর্বস্ব শাসন-ব্যবস্থার প্রকৃতি-পরিবর্তন করা সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। নেকড়ের পক্ষে যেমন সম্ভব নয় তার ত্বকচিহ্নগুলি লোপ করা। তাঁদের উর্বর মস্তিষ্কে তাই এই চিন্তাতরঙ্গ জাগল যে, ভারতবাসী, তথা প্রাচ্যদেশীয়রা নৈর্ব্যক্তিক আইনের শাসনে অনভ্যস্ত ; তারা আবহমানকাল সামন্ততান্ত্রিক শাসনে রাজার প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্যের ধারণায় পুষ্ট, এবং রাজৈশ্বর্যের মহিমায় মুগ্ধ। কাজেই স্বীয় শাসনব্যবস্থাকে লোকপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে তাঁরা আর কোন পথ খুঁজে পেলেন না—কৃষিব্যবস্থার উন্নয়ন বা ঘনঘন দুর্ভিক্ষের নিরসন নয়, রাজনৈতিক অধিকারের তথা গণতান্ত্রিক শাসনের প্রবর্তন নয়, কোথাও ভারতবাসীর ক্ষমতার স্বীকৃতি নয়। তাঁরা এই হৃদয়হীন লুব্ধ বণিকতন্ত্রের মধ্যে, শোষণব্যবস্থার শিরে আরোপ করলেন সামন্তযুগের জাঁকজমক, স্থূল চাকচিক্য। শুরু হল একের পর এক আড়ম্বর অনুষ্ঠান, যার সঙ্গে ভারতবাসীর জীবনের কোন যোগ নেই। ভারতীয় চিত্তে সামন্ততান্ত্রিক উচ্ছ্বাস জাগিয়ে তোলার জন্যে তাঁরা এই দশকে বিশেষত দুটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন : এক, তৎকালীন ব্রিটিশ যুবরাজ বা প্রিন্স অব ওয়েলসের (পরে সপ্তম এডোয়ার্ড) ভারতসফর (১৮৭৫-৭৬) ও দুই, পর বৎসর (১৮৭৬) ডিজরেলীর প্ররোচনায় ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার ভারতসাম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে দিল্লীতে তৎকালীন বড়লাট লর্ড লিটনের দরবার।

স্বেচ্ছান্ধ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত এই সব অপযজ্ঞ-অনুষ্ঠানের ফল যে বিপরীত হয়েছিল, তাতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। তাঁরা নিজেরাই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা চূর্ণ করে ব্যক্তিসম্পর্কহীন, শোষণমূলক আইনের শাসন প্রবর্তন করেন। শৃংখলায় শৃংখলিত করেন ভারতীয় জীবনবিন্যাস। ব্যক্তিগত আনুগত্যের কেন্দ্র উচ্ছন্ন করে

৪০। দ্রষ্টব্য, *Buckland : Bengal under the Lt-governors*, পৃঃ ৫৩২।

পুঁজিবাদের বিমূর্ত কিন্তু ব্যাপক ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রতন্ত্রে এনে বসান। অথচ সমস্তই ঔপনিবেশিকতার আওতায় বহিঃশক্তির প্রয়োজনে পরিচালিত বলে, তার যে সদর্থক দিক, তা কোথাও স্থাপিত হয়নি। ব্যক্তি স্বাধীনতার সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও দায়িত্বের যোগ-সংযোগ ঘটেনি। এবং সর্বোপরি, সাম্রাজ্যবাদের ভাবভিত্তি জাতিবিদ্বেষ ও জাত্যাভিমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে, এই বিমূর্ত, মানবিক সম্পর্কহীন ব্যবস্থায় যারা শাসিত, তারা প্রত্যহ, প্রতিপদে, পীড়িত ও অপমানিত বোধ না করে পারে নি। এমতাবস্থায় নবশিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর কাছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রাক্তন আনুগত্যের আবেগ আশা করা অদ্ভুত মূঢ়তা ছাড়া কিছু হয়নি।

যুবরাজের ভারত-দর্শন সম্পর্কে শিক্ষিত শ্রেণীর মনোভাবনা অত্যন্ত সুষ্ঠু ভাবে প্রকাশ পায় বঙ্কিমের 'কোন স্পেশিয়ালের পত্র' শীর্ষক শ্লেষাত্মক প্রবন্ধে। (প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়ে পরে 'লোক রহস্য' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল)। ভারতবর্ষের জীবন ও সভ্যতা সম্বন্ধে বিদেশী শাসকদের যে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য, এবং অনড় ঔদাসীন্য ও অজ্ঞতা, তাকেই নিপুণ শ্লেষের সাহায্যে আঘাত করেছিলেন বঙ্কিম উক্ত প্রবন্ধে। কিন্তু শুধু ঐ একটি প্রবন্ধ নয়, যুবরাজের ভারত-দর্শন জাতীয়তাবাদের স্রোতকে এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রতিহিংসাপরায়ণতাকে আরো তীব্র করে তোলে বিশেষ কতকগুলি ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে। যুবরাজ এ-দেশের মেয়েদের সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে কোলকাতা হাইকোর্টের সিনিয়র গভর্ণমেন্ট প্লীডর জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় স্বীয় অন্তঃপুরিকাদের দিয়ে যুবরাজের সম্বর্দ্ধনা করান। ঘটনাটি তৎকালীন ভদ্র-শ্রেণীর জাতীয় সম্মানবোধ ও অন্তর্নিহিত রক্ষণশীলতাকে একই সঙ্গে আঘাত করে এবং এর প্রতিবাদও উত্থিত হয় বিচিত্র ভাবে। ইতি-পূর্বেই ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে হিন্দু মেলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট মনোমোহন বসু, এবং তাছাড়াও গিরিশ ঘোষ প্রমুখের উদ্যোগে দেশের প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়, ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তা ছাড়াও এসেছে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটর (প্রথমে নাম হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটর) এবং

বেঙ্গল থিয়েটার। এই রঙ্গালয়গুলি জাতীয়তাবাদী এবং হিন্দু আদর্শ ও গৌরবমূলক বিবিধ নাটিকার অভিনয় করে দেশের মানসে জাতীয়তার এবং প্রাচীনতার প্রভাব ব্যাপক করে তোলে। জগদানন্দের যুবরাজ-সম্বর্দ্ধনাকে বিদ্রূপ করে সাধারণ রঙ্গালয়ে (ন্যাশনাল থিয়েটারে) 'গজদানন্দ' বলে একটি ব্যঙ্গ নাটিকার অভিনয় আরম্ভ হয়। ইতিপূর্বেই সরকার ন্যাশনাল নামধারী সাধারণ রঙ্গালয়গুলির প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এই ঘটনার পর, একজন রাজভক্ত প্রজাকে অপমানিত করা হচ্ছে, এই অজুহাতে, লর্ড লিটন সংবাদপত্র, নাটকাভিনয় ইত্যাদি সব কিছুর ওপর এক দণ্ডমূলক নিষেধাজ্ঞাসর্বস্ব ভার্ণাকুলার প্রেস এ্যাক্ট (Vernacular Press Act) জারী করেন (১৮৭৮)। এই ভাবে রাজপুত্রের রাজ্য-সফর ভারতবাসীর অজ্ঞ হৃদয়ে আনুগত্যের উচ্ছ্বাস না জাগিয়ে, তিক্ততা ও সরকার-বিরোধিতার ভাব জাগায়। সাম্রাজ্যবাদও উপায়ান্তর না দেখে দমননীতির প্রয়োগ বাড়িয়ে চলে।

১৮৭৬-এ অনুষ্ঠিত লর্ড লীটনের দরবার সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আরো তীব্র ও ব্যাপক প্রতিবাদের সৃষ্টি করে। এই অর্থহীন ও ব্যয়বহুল আড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন যখন করা হল তখন ভারতবর্ষের নাভিশ্বাস উঠছে। আফগান যুদ্ধের হামলায় এবং কাল্পনিক রুষ-আতঙ্ক প্রতিরোধের প্রয়োজনে সৈন্যবাহিনী বৃদ্ধির ফলে রাজকোষ শূন্যপ্রায়; অন্য দিকে ভূমি-ব্যবস্থার অব্যবস্থায়, ও কুটিরশিল্পের ক্রমিক উচ্ছেদের ফলে দেশে, বিশেষত দক্ষিণ ভারতে, ব্যাপক দুর্ভিক্ষের অবস্থা বিরাজমান। সেই হাহাকারময় দুর্দিনেই জাঁকজমকের নির্লজ্জ আধিক্য ও ব্যয়বাহুল্য, শিক্ষিত সাধারণকে সবচেয়ে আঘাত করেছিল। তদুপরি ধিক্কারজনক মনে হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের বৈশ্যবৃত্তি—দরবার আহ্বান করে তার খরচ দেশবাসীর কাছ থেকে আদায় করা। এই অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে তাই দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। পর বৎসর ১৮৭৭-এ হিন্দুমেলার অনুষ্ঠানে দেশের অজস্রকণ্ঠ প্রতিবাদের মধ্যে একটি কিশোর-কণ্ঠও যোগ দেয়। সেটি ষোড়শবর্ষীয় রবীন্দ্রনাথের।

ফলত সরকারকে লোকপ্রিয় করার লালসাবশত সাম্রাজ্যবাদীরা যে সব অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন ঠিক সেইগুলিই সরকারকে সবচেয়ে বেশী অপ্রিয় করে তুলেছিল। পরবর্তীকালে ভারতহিতৈষীরূপে পরিচিত ওয়েডারবার্ণ তাই বলেন, 'লর্ড লিটনের রাজত্বের অবসান সময়ে ভারতবর্ষ একটি বিপ্লবের মুখোমুখি হয়ে পড়েছিল'।

এই রাজত্বের অবসান ঘটল ১৮৮০-তে। ইংলণ্ডে ডিজরেলীর (লর্ড বীকনসফীলড) পরিবর্তে প্রধান মন্ত্রী হলেন গ্ল্যাডস্টোন। ভারতে ভাইসরয় হয়ে এলেন লর্ড রিপন। সম্ভবত উইলিয়ম বেন্টিংকের পর লর্ড রিপনের চেয়ে কোন বড়লাট-ই ভারতে শিক্ষিত সাধারণের এত প্রিয় হন নি। ভারতীয়দের রাজনৈতিক অধিকার-স্পৃহার প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে রিপন বলেন, 'সেই সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে যখন ভারতেও জনমতই হবে সরকারের অপ্রতিরোধ্য, এবং অপ্রতিহত প্রভু'। ("The time was fast approaching when popular opinion even in India would become the irresistible and unresisted master of the Government)"। স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনবিধি প্রবর্তন করে শিক্ষিত সাধারণের প্রিয় হন তিনি। এতদ্ব্যতীত লিটনের সৃষ্ট প্রেস আইন ও আফগান যুদ্ধ রদ ও রোধ করে তিনি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করেন। কিন্তু এই রিপনের আমলেই এমন একটি ঘটনা ঘটল যাতে রাজনীতি সচেতন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বুঝতে শিখলেন যে, ব্রিটিশ শাসনের যে অন্তর্নিহিত গ্লানি ও গলদ তা সাম্রাজ্যবাদের চরিত্রনিহিত। ব্যক্তিগতভাবে কোন বড়লাট বিশেষের সদাশয়তা বা উদারতা তা দূর করতে অক্ষম। বড়লাট যত-ই বড়ো হন না কেন, তিনি যন্ত্র মাত্র, যন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদ। তার প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাবার ইচ্ছে থাকলেও উপায় তাঁর নেই। যে ঘটনার ফলে শিক্ষিত সাধারণ এই প্রাথমিক রাজনৈতিক সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করেন, তা ইতিহাসে ইলবার্ট বিল সংক্রান্ত আন্দোলন রূপে আখ্যাত হয়েছে।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ভাইসরয়ের কাউন্সিলের আইন সদস্য (Law member) স্যর সি. পি. ইলবার্ট একটি বিল বা আইনের খসড়া প্রস্তাব

উত্থাপন করেন। এই খসড়া আইনে, ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও বিচারকদের মফঃস্বলের আদালতে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত ইউরোপীয়দের বিচারের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। এই স্বাভাবিক অধিকার রাজকর্মচারী হয়েও ভারতীয়দের ছিলনা। রিপন চেয়েছিলেন 'জাতিবৈষম্যের ভিত্তিতে গঠিত ভারতীয়দের অধিকারহীনতা' (Indian disqualifications based on race distinctions) দূর করতে। কিন্তু এই প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়া মাত্র, ভারতে কায়েমী স্বার্থবাদী ইউরোপীয়রা, বিশেষত নীলকর, চা-কর প্রভৃতি বিদেশী, শোষণমূলক, প্রতিষ্ঠিত পুঁজির ধারকবর্গ, প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা দ্রুত একটি ইয়োরোপীয়ান ডিফেন্স এ্যাসোসিয়েশন (European Defence Association) গঠন করে ফেলে এবং ১৫০,০০০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করে। স্বয়ং বড়লাটকে একঘরে ও কোনঠাসা করে ফেলে তারা এবং বিদ্রোহের হুমকী দিতে থাকে। তাদের মত্ততার কারণ তাদের চরিত্র ও কার্যকলাপের মধ্যে অবশ্যই নিহিত ছিল। নীলকরেরা গ্রামাঞ্চলে যে ব্যাপক সন্ত্রাস এবং চা-করেরা চা-বাগানগুলিতে যে সংগঠিত দাসত্বের সাহায্যে আপনাপন পীড়নমূলক পুঁজির শাসন কায়েম রেখেছিল, কোন শ্রেণী বা জাতি-নিরপেক্ষ আইনের বিচারে তার স্থায়িত্ব সম্ভব ছিল না। সে কথা জেনেই তারা এই প্রস্তাবিত আইনের বিরোধিতা শুরু করে এবং নিজেদের বক্তব্য হিসেবে জানায় যে, অধমজাতি ভারতীয়দের কাছ থেকে স্ব স্ব অপরাধের বিচার তারা কখন-ই মেনে নেবে না, ভারতীয়রা সরকারের সর্বাধিক সম্মানিত কর্মচারী হলেও না। কারণ ভারতীয়রা ভারতীয় বলেই, তাদের বিচার করার যোগ্য নয়। ভারতীয় জনমত অবশ্যই এই গর্বান্ধ ও স্বার্থান্ধ প্রচারের বিরোধিতা করেছিল; জাতীয় অধিকারসাম্য দাবী করেছিল। স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল মহারাণীর ঘোষণার কথা। কিন্তু কিছুতেই কোনও ফলোদয় হল না। সপারিষদ বড়লাটকে ইউরোপীয়দের দাবীর কাছে নতি স্বীকার করতে হল। শেষ পর্যন্ত যে আইনটি গৃহীত হল, তাতে ইয়োরোপীয়দের দাবীই কার্যত স্বীকৃত হয়েছিল।

এই ঘটনাটি ভারতীয় মধ্যবিত্ত-মানসে ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃত চরিত্র এবং তার মধ্যে তাঁদের নিজেদের অপমানিত ও হীন অস্তিত্ব দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশ করল। এতাবৎবাহিত ব্রিটিশ উদারনৈতিক প্রতিশ্রুতির সারশূন্যতাই প্রমাণিত করল না শুধু, প্রতিপন্ন করল যে, দাসজাতি হিসেবে ব্রিটিশ-বিধানে তাঁদের কোন ভবিষ্যত নেই। তাঁদের শিক্ষা, তাঁদের সমাজসংস্কার, তাঁদের সর্বশুভপ্রচেষ্টা, এ-সব কিছু-ই ইংরেজের কাছ থেকে তাঁদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা এনে দিতে পারবেনা। তাঁদের সম্বন্ধে পুঞ্জীভূত ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য দূর করতে পারবে না। হিন্দু জাতীয়তাবাদের অন্যতম ভাবগুরু রাজনারায়ণের সক্ষোভ বাক্য তাঁদের কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হল, "বাহিরে শেক্সপীয়র মিলটন ও ডিফরেন্সিয়ল কেলকুলসের চাকচিক্য, ভিতরে সব ভুওয়া। আমাদের সকল বিষয়েই সাহেবদের উপর নির্ভর, তাঁহাদের সাহায্য ভিন্ন কিছুই করিতে পারি না।" ৪১

বাংলা সাহিত্যে ইলবার্ট বিল সংক্রান্ত আন্দোলনের তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। দেশীয় বিচারকদের অপমানকর অক্ষমতা যে শিক্ষিত মানসকে কিভাবে পীড়িত করেছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় বঙ্কিমের-ই Bransonism শীর্ষক প্রবন্ধে। (লোক রহস্যে সংকলিত)। এই সব ঘটনা সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়ে, সংবাদপত্রে আলোচিত হয়ে, মানুষের মুখে মুখে, জাতির ভাবনার রূপান্তর ঘটায়। ইলবার্ট বিলের আন্দোলনের সময়েই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ন্যাশনাল কনফারেন্স প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৮৩)। সেই বৎসর-ই সুরেন্দ্রনাথ, মূলত রাজনৈতিক কারণে, আদালত অবমাননার দায়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'ন। তাঁর এই দণ্ডাদেশ যুবকদের মধ্যে অভূতপূর্ব উত্তেজনার সঞ্চার করে। তার দু বৎসর পর প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫)। প্রতিষ্ঠিত সরকার প্রথমে এটিকে 'সেফটি ভাল্‌ভ' রূপে দেখলেও মাত্র

৪১। সেকাল আর একাল (১৮৭৪), প্রথম পরিষৎ সংস্করণ ১৩৫৮, পৃঃ ৬৬-৬৭।

দু-তিন বৎসরের মধ্যেই সন্দেহ ও বিদ্বেষের চোখে দেখতে লাগলেন। ১৮৮৮-র ৩০শে নভেম্বর, সেণ্ট্ এ্যানড্রুজ ডিনার উপলক্ষে তৎকালীন বড়লাট লর্ড ডাফরিণ, কোলকাতায়, শিক্ষিত সম্প্রদায় ও কংগ্রেসের রাজনৈতিক দাবীর প্রতি শ্লেষোক্তি করে অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন ঃ

"I would ask, then, how, any reasonable man could imagine that the British Government would be . content to allow this microscopic minority to control their administration of that majestic and multiform empire for whose safety and welfare they are responsible in the eyes of God and before the face of civilization…"

ঈশ্বরের চক্ষু এবং সভ্যতার মুখের প্রতি দায়িত্বভারে বিব্রত এই দাম্ভিক সাম্রাজ্যবাদী, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি তাচ্ছিল্য জানিয়ে আরো বলেন, "…It appears to me a groundless contention that it represents the people of India." অতঃপর সাম্রাজ্যাভিমানে স্ফীত কলেবর হয়ে বিদেশী বণিক গোষ্ঠির সভায় আত্মীয়রূপে স্বপক্ষ সম্পর্কে এই মিথ্যাময় দাবী উপস্থাপিত করেন ঃ

"These persons ought to know that in the present condition of India there can be no real or effective representation of the people, with their enormous numbers, their multifarious interests and their tessalated nationalities. They ought to see that all the strength, power, and intelligence of the British Government are applied to the prevention of one race, of one interest, of one class, of one religion, dominating another, and, they ought to feel that in their peculiar position there can be no greater blessing to the

country than the existence of an external, dispassionate and immutable authority…"

"…When the Congress first started I watched its operation with interest and curiosity, and I hoped that in certain fields of useful activity it might render valuable assistance to the Government……I can not help expressing my regret that they should have concerned themselves instead with matters in regard to which their assistance is likely to be less profitable to us."

সাম্রাজ্যাভিমানে এই প্রশাসকের দৃষ্টি এতই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে, এঁর মতে জনপ্রতিনিধিদের কর্তব্য হল কেবল তাঁদের লাভের যন্ত্র হিসাবে কাজ করা। সেইটা হয়নি বলে ক্ষোভে মত্ত হয়ে তিনি মিথ্যাদূষণের মাত্রা বাড়িয়ে আরো বলেন ঃ

"It is a still greater matter of regret to me that the members of the congress should have become answerable for the distribution—as their officials have boasted—amongst thousands and thousands of ignorant and credulous men, of publications… whose manifest aim is to excite the hatred of the people against the public servants of the crown in this Country." ৪২

ধর্ম্মতত্ত্ব গ্রন্থটি যখন প্রকাশিত হচ্ছে, রাজনৈতিক বোধ তখন একটি সুস্পষ্ট আকার লাভ করেছে। ব্রিটিশ শাসকদের সদিচ্ছায় শিক্ষিত

৪২। ডাফরিণের সম্পূর্ণ বক্তৃতার জন্যে, *Indian Constitutional documents. Volume II. Edited by, Anil Chandra Banerjee. Published by, A. Mukherjee &Co, Calcutta, 1948.* পৃঃ ৯১—৯৯ দ্রষ্টব্য।

শ্রেণীর আস্থা প্রায় লুপ্ত হয়েছে, তাদের প্রদত্ত আঘাতে আত্মা হয়েছে পীড়িত এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা ব্রিটিশ শাসনের প্রসাদপ্রদত্ত বলে, পাশ্চাত্য রীতি-নীতি ও সভ্যতার প্রতিও বিরাগ বা ক্ষেত্রবিশেষে বিদ্বেষ সঞ্চারিত হয়েছে। এই বিরাগের অপর উৎস খুঁজতে গেলে সংস্কার-আন্দোলনের ক্রমিক অবক্ষয়ের দিকে তাকাতে হবে।

২

১৮৭০-এর পর রাজনৈতিক আবহাওয়া কিভাবে ক্রমেই তপ্ত হতে থাকে তার কিছু আভাস পাওয়া গেল; কিন্তু নবযুগের যে প্রধান ধারা, সমাজ-সংস্কার আন্দোলন, তার ক্রমিক গতিহ্রাস, অবক্ষয় ও শেষ পর্যন্ত বিপর্যয়ও এই যুগে-ই ঘটেছিল। ঘটেছিল আশ্চর্য দ্রুততার সঙ্গে, প্রকৃত প্রস্তাবে দশ বৎসরের মধ্যে (১৮৬৮-৭৮)। কেশবচন্দ্র সেনের ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম সমাজের ভিত্তিস্থাপন থেকে (২২শে জানুয়ারী ১৮৬৮) সাধারণ ব্রহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা, (১৫ই মে ১৮৭৮) এই কালের মধ্যেই সমাজসংস্কারের ধারা অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তকে যদি আমরা কেবলমাত্র ব্রাহ্ম-সমাজের-ই ইতিবৃত্ত হিসেবে না দেখে, ঘটনা হিসেবে সেটি যা, সে-ই হিসেবে দেখি, তবে-ই আমরা এই বিপর্যয়ের প্রকৃতি অনুধাবন করতে পারব। কারণ ব্রাহ্মসমাজ, দেশ ও কাল বহির্ভূত কোন পদার্থ ছিল না; সেটি ছিল তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু সমাজের সবচেয়ে সচেতন অংশ। তাঁরা সেইকালে, সজ্ঞানে, সচেষ্টভাবে সমাজ-সংগঠনকে নতুন রূপ দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন। এবং সমাজকে তার পুরনো আকার, তথা তার পুরনো রীতি, প্রথা, আচার ও ব্যবহার-প্রণালী ভেঙে নতুন আকার দিতে হলে, স্বভাবতই পুরনো বিশ্বাসের পরিবর্তে নতুন বিচার, পুরনো সংস্কারের পরিবর্তে নতুন ধারণা, সংক্ষেপে সমাজ-জীবনের সর্বক্ষেত্রে, এক ব্যাপক নতুন দৃষ্টির প্রয়োজন হয়। সন্দেহ নেই যে, সেইযুগে ব্রাহ্মসমাজের এই দৃষ্টি ছিল। এবং এই দশকের সূচনায় ব্রাহ্মসমাজের নেতা হিসেবে এবং এই নবদৃষ্টির অধিকারী

হিসেবে সাধারণ্যে পরিচিত ও স্বীকৃত ছিলেন কেশব চন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪)।

প্রধানত যে প্রশ্নে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বিরোধ উপস্থিত হয়ে কেশবচন্দ্র ১৮৬৮-তে নতুন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন, সেই প্রশ্নটির স্বরূপ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করলেই এই নবদৃষ্টির প্রকৃতি বোঝা যাবে। এমন একটি ধারণা আজও প্রচলিত আছে যে, ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে আচার্য হিসেবে অব্রাহ্মণের বসার অধিকার নিয়েই দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের বিরোধ ও পরিণামে বিচ্ছেদ ঘটে। ধারণাটি অর্দ্ধসত্যমাত্র। কেশবচন্দ্র এই দাবী উত্থাপন করেছিলেন এটি যেমন সত্য, দেবেন্দ্রনাথ সেই দাবী মেনে নিতে অগ্রসর হয়েছিলেন, সে-ও তেমন-ই সত্য। ইতিহাসে উভয়ের-ই প্রমাণ আছে। বিরোধের সূত্রপাত হয় অন্য কারণে। কেশবচন্দ্র সেন চেয়েছিলেন বাংলাদেশে এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাইতেও যেখানে যত ব্রাহ্মসমাজ আছে, তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে একটি প্রতিনিধিমণ্ডলী বা প্রতিনিধিসভার দ্বারা, সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত ব্যবস্থা পরিচালনা করতে। ব্রাহ্মসমাজের বিধিগুলি (শুধু ধর্মবিশ্বাস নয়, সমাজজীবনের আবশ্যকীয় বিধানসমূহ) বিধিবদ্ধ করতে ; ব্রাহ্মসমাজে ব্যক্তির—এক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথের—একনায়কত্ব লোপ করতে। নিয়মতান্ত্রিকতার প্রতিষ্ঠা করতে। সংক্ষেপে তাঁর দাবী ছিল, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্রাহ্মসমাজকে পুনর্গঠিত করা হোক। এই দাবী দেবেন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেন নি। ট্রাস্টি-র অধিকার বলে সমাজের কর্মকর্তা নিয়োগের অধিকার ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। এই কারণেই কেশবচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথের সংস্রব ত্যাগ করে নতুন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

এই মূল গণতান্ত্রিক দাবীর সঙ্গে স্বভাবতই জাতিভেদ অস্বীকার, নতুন বিবাহবিধি প্রবর্তন, ইত্যাদির অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ছিল। আর এই গণতান্ত্রিক দাবী উত্থাপন করেছিলেন বলেই কেশবচন্দ্র সেদিন শিক্ষিত ও উন্নতিকামী যুবকদের ব্যাপক ও গভীর সমর্থন লাভ করেছিলেন।

যে সমর্থন, ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ থাকা সত্ত্বেও দেবেন্দ্রনাথ পান নি। ৪৩ আর এই সমর্থন পেয়েছিলেন বলেই সেই দশকের সূচনা থেকে কয়েক বৎসর কেশবচন্দ্রের শক্তিবৃদ্ধি হয়েছিল, বিবিধ সামাজিক সদনুষ্ঠানে সফলভাবে আত্মনিয়োগ করতে পেরেছিলেন তিনি।

কিন্তু নবযুগের যে গণতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতি নিয়ে কেশবচন্দ্র সমাজে এগিয়ে এসেছিলেন, শেষ পর্যন্ত সে প্রতিশ্রুতি তিনি পালন করেন নি। পালন করতে অস্বীকার করলেন। এর ফলে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদের মধ্যে প্রথমে মতভেদ ঘটে, বিভিন্ন বিষয়ে সেই মতভেদ দল ও উপদলের সৃষ্টি করে,—কারণ সমাজে নিয়মতন্ত্র না থাকায়, কেশবচন্দ্রের একনায়কত্বের ফলে, কোন গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল না। অবশেষে সেই একনায়কত্ব যখন উন্নতিশীল দলে বিস্তৃত ফাটল সৃষ্টি করেছে, তখন তথাকথিত কুচবিহার বিবাহ উপলক্ষ করে এই উন্নতিশীল দলটি চূর্ণ চূর্ণ হয়ে যায়। এই কলহ শুধু কেশবচন্দ্রের নৈতিক ভিত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলল তাই নয়—পুরনো পরিত্যক্ত গ্রাম্য সমাজের চণ্ডী মণ্ডপের ঘোঁট স্থানীয় এই বিবাদ প্রতিপন্ন করল যে, শিক্ষিত সমাজের সবচেয়ে সচেতন গোষ্ঠিই সর্বাংশে লক্ষভ্রষ্ট হয়েছেন। বস্তুত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম ব্যতিরেকে কেবলমাত্র সমাজসংস্কারের ভূমিকা তৎকালীন পরিবেশে সংকীর্ণ হয়ে এসেছিল। তাই সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ গঠিত হবার পরও দেখি যে, সংস্কারের নামে তাঁরা বিবিধ তুচ্ছ বিষয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন; জামাই ষষ্ঠী কি ভ্রাতৃদ্বিতীয়া অথবা বিজয়ার আলিঙ্গন ধর্মবিরুদ্ধ ও কুসংস্কারমূলক কি না, এই তাঁদের বিশেষ দুশ্চিন্তার উৎস। বৃহৎ কোন লক্ষ নেই, ফলে ঐক্যও অনুপস্থিত; ব্যক্তি-স্বাধীনতা নিতান্তই আত্মপ্রাধান্য ও মতবিলাসিতায় পর্যবসিত হয়েছে, অথচ তার

৪৩। দেবেন্দ্রনাথের প্রতি ব্যক্তিগত অনুরাগ সত্ত্বেও এবং কেশবচন্দ্রের সঙ্গে কিছু মতান্তর সত্ত্বেও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কেশবচন্দ্রের সঙ্গে পুনর্মিলিত হন (১৮৬৯)। শিবনাথ শাস্ত্রী ও আনন্দমোহন বসু প্রমুখ শিক্ষিত ও উন্নতিকামী যুবকেরাও কেশবচন্দ্রের সমাজে দীক্ষা গ্রহণ করেন। (২২শে আগষ্ট ১৮৬৯)।

এক দশক পূর্বে সমস্ত মানসিক পরিমণ্ডল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। যে দৃষ্টিভঙ্গী থাকলে সমাজসংস্কারের সঙ্গে রাজনৈতিক ও আর্থিক জীবনের ব্যাপক পরিবর্তনের সংযোগসাধন সম্ভব হয়, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তা ছিল না। এবং তা ছিল না বলেই, তাঁদের "সংস্কার" কেন্দ্রিত হল কতকগুলি সামাজিক উৎসব ও ক্রিয়ার দিকে এবং ক্ষেত্রবিশেষে মানুষের সহজ আনন্দের দিকেও। পরিণামে তাঁরা বৃহৎ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। যুবকদের মধ্যে যাঁরা ব্যক্তিগত নৈতিক জীবন সম্বন্ধে অতিরিক্ত চিন্তিত ছিলেন, তাঁরা প্রাচীন বিশ্বাসের আশ্রয় নিলেন; যাঁরা রাজনৈতিক ভাবাপন্ন, তাঁরা ক্রমেই বিশুদ্ধ রাজনীতির দিকে ঝুঁকলেন। সংস্কারবাদ স্বয়ং কতকগুলি চিহ্নিত সংস্কারে পরিণত হল। সদর্থক ভূমিকা বিশেষ রইল না তার। এই অবস্থায়, প্রসারণশীল জাতীয়তাবাদ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মরক্ষার তথা বিশেষ অধিকার রক্ষার হাতিয়ার হয়ে প্রতিষ্ঠিত সমাজ-কাঠামোর, সুতরাং প্রথা, আচার ইত্যাদির আশ্রয়ে, রক্ষণশীলতার প্রধান বাহক হয়ে দাঁড়াল।

সম্ভবত এই পরিণতির ধারা অনুসরণ করতে হলে কেশবচন্দ্র সেনের মতবিবর্তনের ধারার বিস্তৃততর অনুশীলন প্রয়োজন। কারণ কেশবচন্দ্রের ভাববিপর্যয়ের মধ্যে বিচারহীন বিশ্বাসের সঙ্গে নবযুগের যে বিরোধ তা স্পষ্ট হয়, এবং সেই বিশ্বাসের আশ্রয়ে গঠিত মধ্যবিত্ত আদর্শের যে সীমাবদ্ধতা, তাও অস্পষ্ট থাকে না। আর শুধু তাই নয় বিচারহীন বিশ্বাসকে যাঁরা স্বীকার করেছেন, তাঁদের বিচার যে শেষ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ও অসার্থক না হয়ে পারে না, তাও এই ধারা অনুসরণ করলে মানতে হয়। এবং সর্বোপরি, নিজেদের মধ্যে সমস্ত মতবিরোধ সত্ত্বেও সমগ্রভাবে মধ্যবিত্ত আদর্শবাদ ও তার ভিত্তিতে মধ্যবিত্ত সংস্কার-প্রচেষ্টা যে শেষ পর্যন্ত নিতান্ত সীমিত, সেই সিদ্ধান্তও এড়ানো চলে না।

১৮৬৬-র ১লা নভেম্বর কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম প্রতিনিধি সভা গঠন করেন এবং ঐ বৎসর ১১ই নভেম্বর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ঘোষিত হয়। পর বৎসর ১৮৬৭, ৭ জানুয়ারী—১৫ এপ্রিল) তিনি উত্তর ভারত পরিক্রমা করেন এবং শিখ সমাজের

গণতান্ত্রিক গঠন দেখে অনুপ্রাণিত হ'ন। কিন্তু ইতিপূর্বেই তিনি তাঁর বক্তৃতায় ও ধর্মপ্রচারে, খৃষ্টীয় পাপবোধ, খৃষ্টপ্রমুখ অবতারের বিশেষ মহিমা এবং ব্রিটিশ শাসনের সদগুণ, পাপ-স্বীকার, অনুতাপ ও প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা, ইত্যাদির বিষয়ে পুনঃপুনঃ অবতারণা করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের (যথা, তৎকালীন বড়লাট লর্ড লরেন্স-এর এবং পরবর্তী বড়লাটদেরও) প্রীতি অর্জন করেন এবং তাঁর শিক্ষিত অনুরাগী-মণ্ডলের মধ্যে এক ধরনের আত্মবিশ্বাসহীন ভাবাবেগের সঞ্চার করেন। ১৮৬৮-তে তাই তিনি যখন দ্বিতীয়বার উত্তর ভারতে ধর্মপ্রচারে যান, তখন ধর্মের উদগাতা হিসেবে তাঁকে কেন্দ্র করে এক নরপূজার প্রাদুর্ভাব হয়। কেশবচন্দ্র এই আত্মপূজাকে সমর্থন জ্ঞাপন করেন নি ; কিন্তু এই প্রবণতার বিরোধিতাও করেন নি তিনি। বরং যাঁরা এই প্রবণতার বিরোধিতা করেন (যেমন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও যদুনাথ চক্রবর্ত্তী) তাঁদের প্রতি কিছু অপ্রীতি প্রকাশ করেছিলেন। ১৮৬৯-এর ২২শে আগষ্ট, তাঁর নতুন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের দ্বারোদ্ঘাটন হয় এবং শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ উৎসাহী ও বিচারশীল যুবকবৃন্দ দীক্ষা নিয়ে ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ করেন। বৈষ্ণবীয় রীতিতে প্রচারিত মানুষের অধিকারসাম্যের ধারণাই যে শেষ পর্যন্ত এঁদের ব্রাহ্ম সমাজে আকর্ষণ করেছিল, শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিতে তা লিপিবদ্ধ আছে। ৪৪

১৮৭০-এর ফেব্রুয়ারীতে কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে যান এবং অক্টোবরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ইংলণ্ডে তিনি সামাজিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক ইত্যাদি বিবিধ কার্যকলাপে লিপ্ত হন এবং মিল প্রভৃতি দার্শনিক এবং রাণী ভিক্টোরিয়া ও গ্ল্যাডষ্টোন প্রভৃতি কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। ইংলণ্ড থেকে তিনি ভিক্টোরীয় মধ্যবিত্ত পরিবারের গঠন ও রীতি-নীতির দ্বারা বিশেষ চমৎকৃত হয়ে দেশে ফেরেন। সেই সব রীতি-নীতির অন্তর্বর্তী পুঁজিবাদী আর্থিক সংগঠন ও

৪৪। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ৯০-৯৪, প্রথম সিগনেট সংস্করণ। অতঃপর শি. শা. আত্মচরিত রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্ত্রী-পুরুষের অধিকার-বৈষম্য, তাঁকে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয় না। ইংলণ্ড থেকে প্রত্যাবর্তনের বারোদিনের মধ্যে তিনি ১৮৭০-এর নভেম্বরের সূচনায় বিখ্যাত 'ভারত সংস্কার সভা' বা Indian Reform Association স্থাপন করেন। সভার পাঁচটি বিভাগের উল্লেখ করলেই তাঁর লক্ষ স্পষ্ট হবে। (১) স্ত্রী জাতির উন্নতি—তার জন্যে শিক্ষয়িত্রী ও বালিকা-বিদ্যালয় ও সভা। (২) শিক্ষা—তার জন্য শিল্প-বিদ্যালয় ও শ্রমিক বিদ্যালয়। এইসব বিদ্যালয়ের পাঠক্রম নিম্নরূপ ছিল; (*i*) সূত্রধরের কাজ, (*ii*) ঘড়ি মেরামত (*iii*) মুদ্রাঙ্কন ও লিথোগ্রাফ (*iv*) সূচীকার্য ও (*v*) খোদাই। (৩) সুলভ সাহিত্য—এই উদ্দেশ্যে এক পয়সা মূল্যে সরল ভাষায় সাপ্তাহিক 'সুলভ সমাচার' প্রচার। (৪) সুরাপান ও মাদক নিবারণ—এই উদ্দেশ্যে একাধিক পত্রিকা ও পুস্তিকা প্রচারিত হয় এবং (৫) দাতব্য,—অক্ষম, অনাথ ও আতুরদের যথাসাধ্য সাহায্য দেওয়া এই বিভাগের উদ্দেশ্য ছিল।

কেশবচন্দ্রের এই সংস্কার প্রচেষ্টায় হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও ভারতীয় বা অভারতীয় সকলেই আহূত হন এবং সব গোষ্ঠি থেকেই কিছু কিছু মানুষের সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু পরিচালনা কেশবচন্দ্র ও তাঁর নিযুক্ত ব্রাহ্ম সামাজিক ব্যক্তিদের হাতে ন্যস্ত ছিল। বস্তুত এই সময়টিকে কেশবচন্দ্রের, তথা মধ্যবিত্ত সংস্কারবাদের স্বর্ণ যুগ বলা যেতে পারে। ইংলণ্ডে লগ্নী পুঁজির স্বাচ্ছন্দ্যে পুষ্ট ভিক্টোরীয় মধ্যশ্রেণীর, সমাজতন্ত্র-বিরোধী ও ধর্মাশ্রয়ী জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন মনে হয়। ইংলণ্ডের মধ্যশ্রেণীর সঙ্গে দেশীয় মধ্যশ্রেণীর পার্থক্য তাঁর চিন্তাকে কতদূর প্রভাবিত করেছিল তা জানা যায় না। এই সব বিবিধ কাজে তিনি যুবকদের উৎসাহ ও সমর্থন পেয়েছিলেন এবং কোথাও সরকারের বিরোধিতা উদ্রিক্ত করেন নি।

'ভারত সংস্কার সভা'র প্রতিষ্ঠার পর অন্য যে বৃহৎ সামাজিক সংস্কারের কাজে কেশবচন্দ্র হাত দেন তার পরিণাম ফল ১৮৭২-এর বিশেষ বিবাহ আইন (Special Marriage Act.)। বিশেষ বিবাহ আইন

কেশবচন্দ্র চান নি ; তিনি চেয়েছিলেন ব্রাহ্ম বিবাহ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আইন। কিন্তু তাঁর মতানুযায়ী, ব্রাহ্ম সমাজ, হিন্দু সমাজ থেকে স্বতন্ত্র একটি সমাজ ; অপর পক্ষে দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ বসুর ভাবধারায় চালিত আদি ব্রাহ্ম সমাজ সঙ্গত ভাবেই ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দু সমাজের-ই অগ্রসর অংশ বলে দাবী করেছিলেন। ফলে কেশবের স্বতন্ত্র আইন ও তার অন্তর্নিহিত ধারণাকে তাঁরা বাধা দেন। তাই ব্রাহ্ম বিবাহ আইন না হয়ে সৃষ্ট হ'ল বিশেষ বিবাহ আইন, যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হলেও ঐতিহাসিক দিক দিয়ে সংস্কারবাদীদের দুর্বল করল।

এই সময়েই (১৮৭২, ১৫ সেপ্টেম্বর) রাজনারায়ণ বসু যখন 'হিন্দু-ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বিষয়ক বক্তৃতায় ব্রহ্মোপাসনাকে হিন্দুধর্মের সারভাগ বলে ঘোষণা করেন (যে মত স্বয়ং রামমোহন 'চারি প্রশ্নের উত্তর' ও 'পথ্য প্রদান' প্রভৃতি পুস্তিকা ও গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছিলেন) তখন কেশবচন্দ্র এই মর্মে তার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন যে, ব্রাহ্মধর্ম হিন্দু-ধর্মের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। এই স্বাতন্ত্র্যের দাবী নিয়ে তাঁর পক্ষ থেকে স্বতন্ত্র বিবাহ বিধির দাবীও উত্থিত হয়। হিন্দু সমাজ ও ঐতিহ্য থেকে তাঁদের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের দাবী, ঐতিহাসিক ও সামাজিক উৎস বিচারে সত্য ছিল না, এবং এর ঐতিহাসিক ফল শুভ হয় নি। কেশবের তৎকালীন সমর্থক শিবনাথ শাস্ত্রী, যিনি সেই সময়ে রাজনারায়ণের বক্তৃতার প্রতিবাদ করেন, পরে 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' গ্রন্থে এই স্বাতন্ত্র্যের দাবী ও প্রচেষ্টার ফল সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি করেন যে, এর ফলে সংস্কারক দল হিসেবে তাঁরা বৃহত্তর জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, তাদের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হন। তাঁদের লক্ষচ্যুতির পথে এই ঘটনাই প্রথম পদক্ষেপ বলা যায়—একটি সমাজের প্রাগসর অংশ না হয়ে, একটি আত্মসচেতন ও সংস্কারাভিমানী ক্ষুদ্র মধ্যবিত্ত গোষ্ঠিতে রূপান্তরের পথে অগ্রসর হন তাঁরা। ৪৫

৪৫। কেশবচন্দ্রের কালে, কি ভাবে এই সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ ঘটেছিল তা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও শিবনাথ শাস্ত্রীর বন্ধু, ভারতসভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা

. সন্দেহ নেই যে, যদি তাঁরা ধর্ম নিরপেক্ষ একটি বিবাহবিধি দাবী করতেন তাহলে সামাজিক স্বাধীনতার পথে ভারতীয় জীবন বহু দূর অগ্রসর হত। এই বিবাহবিধি সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর মত স্থাপন করে সরকারকে যে পত্র দেন তাতে তিনি স্পষ্টত বলেছিলেন :

"I concur in the opinion expressed by the learned Professor Max Muller, "that modern legislation can regard marriage only in the light of a civil contract leaving the religious ceremonies, if any, to be settled by the contracting parties......". (Letter dt. March 4th, 1872, to the Secretary to the Government of Bengal).

কিন্তু কেশবচন্দ্র বিবাহকে একটি সামাজিক চুক্তি বা Civil contract রূপে দেখতে, ভাবতে বা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না— সেটা তাঁদের দাবী ছিল না আদৌ। ফলে এই ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক

ও আর্য্যদর্শন পত্রিকার সম্পাদক, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের নিম্নোদ্ধৃত সাক্ষ্য থেকে পাওয়া যাবে: "ভারত আশ্রমে একটি সঙ্গতসভা প্রতিষ্ঠাপিত হইল। তথায় নির্দ্দিষ্ট দিনে ব্রাহ্মগণ ধর্ম্মবিষয়ে তর্কবিতর্ক করিয়া পরস্পরের সন্দেহ ভঞ্জন করিতেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্ম সমাজের যে কোন ব্যক্তির প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার ছিল। এখন হইতে নিয়ম হইল যে, রেজিস্টরীভুক্ত ব্রাহ্ম ব্যতীত আর কেহ সঙ্গত সভায় কোন প্রশ্নাদি করিতে পারিবে না। সুতরাং আমরা কয়জনে বাদ গেলাম। আমাদিগকে ব্রাহ্মগণ আর প্রেমের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন না।··· তখন হিন্দুসমাজ হইতে ব্রাহ্ম সমাজের আর বিশেষত্ব আমাদের উপলব্ধি হইল না। সেই দলাদলি, সেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও সেই সম্প্রদায় বহির্ভূত লোকদিগের উপর ঘৃণা। বিশেষের মধ্যে এই যে, হিন্দুসমাজে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বিধর্ম্মীর প্রতি ঘৃণা কালে শিথিলিত হইয়া গিয়াছে—কিন্তু এই নব প্রতিষ্ঠিত সমাজের সকল-ই নূতন ও তীব্র।"

(বীরপূজা (২): ভক্তিবীর সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অঘোর নাথ গুপ্ত, পৃ: ৬—৭। দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্র গ্রন্থাবলী, হিতবাদী কার্য্যালয়, কলিকাতা ১৩১৭)

বিবাহ এল তাঁদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও এবং এর সদর্থক দিকটি সমাজে গৃহীত হল না।

অন্যপক্ষে যদি তাঁরা রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের ধারায় হিন্দু সমাজের সংস্কারমানসে বিবাহবিধি সংস্কার করতে অগ্রসর হতেন—দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং যা কিয়দংশে করেছিলেন—তাহলে তা ব্যাপক ও গভীর সামাজিক আলোড়নের সৃষ্টি করত সন্দেহ নেই। কিন্তু জনসমাজ-বিচ্ছিন্ন কোলকাতা-কেন্দ্রিক নাগরিক মধ্যশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে তিনিও তাঁর দলস্থ সকলে সেই ব্যাপক সমাজচেতনা হারিয়েছিলেন। ফলে ইতোনষ্টস্ততো ভ্রষ্ট হলেন তাঁরা। যা চাইলেন তা পেলেন না, এবং যা পেলেন তা চাইলেন না।

এই সময় থেকেই কেশবচন্দ্র ও তাঁর সহযোগী যুবক ব্রাহ্মদের অধিকাংশের সঙ্গে মতভেদ স্পষ্টত প্রকাশিত হতে থাকে। এই মতবিরোধের কারণ বিস্তৃত আলোচনার দাবী রাখে, কারণ এর স্বরূপ উপলব্ধি করলে বোঝা যাবে যে, সেই সময়ে মধ্যশ্রেণী, বিশেষত কেশবচন্দ্র, নবযুগের প্রেরণা থেকে—রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়দত্তের যুক্তি-নির্ভর ঋজুতা থেকে—কতদূর সরে এসেছিলেন। বোঝা যাবে যে, পরবর্তী দশকে নয়া হিন্দুত্ব ও অবতারবাদ কেন অনিবার্য শক্তি অর্জন করেছিল। বাহ্যত বিরোধ উপস্থিত হল কেশবচন্দ্রের সামাজিক কুণ্ঠাকে কেন্দ্র করে—যে ভাবে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল। স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে, মেয়েদের জ্যামিতি, লজিক, মেটাফিজিকস্ ইত্যাদি পঠনপাঠনের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এ সকল পড়াইয়া কি হইবে? মেয়েদের আবার জ্যামিতি পড়িয়া কি হইবে?" ৪৬। অনুরূপ-ভাবে ব্রাহ্ম সামাজিক প্রার্থনায় মেয়েদের পর্দার বহির্ভাগে এসে বসার সম্বন্ধেও তাঁর সমর্থন ছিলনা। ব্রাহ্ম সমাজে প্রথম বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠি—স্ত্রী-স্বাধীনতার দল—এই উপলক্ষেই উদ্ভূত হয়।

কিন্তু এহ বাহ্য, যদি সেই সমাজে বিভিন্ন মতের আলোচনার এবং আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা বর্তমান থাকত। তাহলে,

৪৬। শি. শা. আত্মচরিত পৃঃ ১৪৪, ঐ।

মত পার্থক্য সমাজ শরীরে ভাঙন ধরাতে পারত না। কিন্তু সেই ঐতিহ্য সেখানে উপস্থিত ছিলনা। কারণ শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায়, "উপাসক-দিগকে ডাকিলেই তাঁহারা স্বাধীন ভাবে মতামত প্রকাশ করিতে লাগিলেন, অনেক বিষয়ে মতভেদ ও তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইতে লাগিল। যুবকদলের অনেকে উপাসক মণ্ডলীর কার্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালীর স্থাপনের জন্য উৎসুক হইলেন। সেটা স্বাভাবিক কিন্তু কেশববাবু বোধ হয় তাহা পছন্দ করিলেন না। কারণ কিছুদিনের মধ্যেই দেখিলাম, উপাসক মণ্ডলীর সভ্যগণকে মধ্যে মধ্যে ডাকা রহিত হইল। বৎসরান্তে একবার একটা সম্মিলিত সভার মতো হইত, এইমাত্র অবশিষ্ট রহিল।" ৪৭। ফলে, ১৮৭৬ নাগাদ, "ব্রাহ্ম যুবকগণের ধারণা জন্মিয়াছিল যে, তিনি এক সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত বিবাদ করিয়া ব্রাহ্ম প্রতিনিধি সভা গঠন পূর্বক ব্রাহ্ম সমাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রবর্তিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ক্রমশ তাঁহার নিয়মতন্ত্র প্রণালীতে বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে। তিনি এখন হয়তো মনে করিতেছেন যে, ধর্ম্ম সমাজের কার্যে সাধারণের হাত না থাকিয়া ঈশ্বর প্রেরিত মহাজনের হাতে থাকা কর্তব্য। এই কারণে তিনি সমাজের কার্যে অপরের কর্তৃত্ব স্থাপিত হইতে দিতে চান না। নিজে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া থাকিতে চান।" ৪৮

সংক্ষেপে, সমাজ-সংগঠনে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন তিনি। এবং গণতন্ত্রকে গ্রহণ করতে চাইলেন না বলে-ই গোষ্ঠি নির্বিশেষে সমস্ত প্রোটেস্টান্ট (Protestant) আন্দোলনের যা প্রথম কথা, বিবেকের স্বাধীনতা, তাও সর্বক্ষেত্রে সর্বসময়ে অস্বীকার না করে পারলেন না। সামাজিক বিধি ও কর্তব্য নিরূপণের ক্ষেত্রে তাঁর সমসাময়িক ও প্রথমে সহকর্মী শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায়, "কেশববাবু তাঁহার সমুদায় কার্য যেরূপ ঈশ্বরাদেশ বলিয়া উপস্থিত করিতেন, এবং সকলকে ঈশ্বরাদেশ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এবং

৪৭। শি. শা. আত্মচরিত পৃঃ ১১৭।

৪৮। ঐঃ পৃঃ ১৩৩।

তদনুরূপ আচরণ করিতে হইবে বলিয়া উপদেশ দিতেন, তাহাতে আমার ভয় হইত যে, তাঁহার সঙ্গের লোকের চিন্তার স্বাধীনতা নষ্ট হইবে।......
কেশববাবু যখন আশ্রম স্থাপন করিলেন (ভারত আশ্রমঃ ১৮৭২) তখন তাহাকে ঈশ্বরাদিষ্ট কার্য বলিয়া স্থাপন করিলেন। কেবল তাহা নহে, ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য ব্রাহ্মদিগকে আহ্বান করিলেন। এবং সে ভাবে যাঁহারা গ্রহণ করিলেন না, তাঁহাদের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।" ৪৯

গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও যুক্তিবিচারের পরিবর্তে এল ব্যক্তির সর্বময় কর্তৃত্ব এবং তার নৈতিক ভিত্তি হিসেবে প্রচারিত হল আদেশবাদ। ঈশ্বরাদিষ্ট ব্যক্তি সকল প্রশ্নের উর্দ্ধে। তাঁর কাজ সামাজিক মানুষের সমালোচনার সীমাবহির্ভূত।

এবং শুধু তিনি নন, তৎকর্তৃক নিযুক্ত প্রচারকেরাও সামাজিক মানুষের সব সমালোচনার উর্ধ্বে। বলা বাহুল্য, কর্তৃত্বের ধারণাকে, বিচারহীন অন্ধ আনুগত্যকে যদি স্বীকার করে নিতে হয়, তাহলে পুরনো সমাজের কর্তৃত্ব, তার বিধি-নিষেধ ও প্রথা-আচারের আনুগত্য অস্বীকার করা অর্থহীন হয়ে পড়ে। বিচারহীন আনুগত্য যদি কর্তব্য হয়, তাহলে কোন সময়েই সমাজসংস্কারের কোন নৈতিক ভিত্তি থাকে না। এবং ঈশ্বরাদিষ্ট ব্যক্তিদের তর্কাতীত বলে মেনে নিলে, মানুষের স্বাধীন বিচারবুদ্ধির মূল্য ও মর্য্যাদা অগ্রাহ্য হয়। সর্বোপরি, ঈশ্বরাদিষ্ট ব্যক্তিদের ধারণা স্বীকার করে নিলে, অবতারবাদের স্বীকৃতিও এসে পড়ে, কারণ ঈশ্বরাদিষ্ট ব্যক্তি ও অবতারের মধ্যে ধারণাগত পার্থক্য থাকলেও কার্যত প্রভেদ অকিঞ্চিৎকর।

মূলকথা এই যে, শুধুমাত্র বিশ্বাসকে-ই যদি জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান ভাব বলে গ্রহণ করতে হয়, তাহলে, কি বিশ্বাস করি, কেন বিশ্বাস করি, এই সব প্রশ্নেরও কোন তাৎপর্য থাকে না। কারণ বিশ্বাসের গভীরতা ও দৃঢ়তা এবং বিশ্বাসের গাঢ়তাই সেক্ষেত্রে সর্বাধিক মূল্যবান। সুতরাং ঈশ্বরকে যে ভাবেই ভাবা হোক না কেন, সেই

৪৯। শি. শা. আত্মচরিত ঐ পৃঃ ১১৫।

ভাবনায় সম্পূর্ণভাবে আত্মনিযুক্ত থাকাই একান্ত মূল্যবান হয়ে পড়ে, সেই ভাবনাকে যাচাই করা বা বিচার করা চলে না। বিচার এসে পড়লে সেই একাগ্র বিশ্বাস থাকে না। বিশ্বাস ও বিচার পরস্পর বিরোধীভাব. কাজেই সংস্কারবাদীরা যখন ধর্মাশ্রয়ী বিশ্বাসকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নিলেন, তখন নিজেদের সংস্কারবাদের নৈতিক ভিত্তিমূল নিজেরাই অস্বীকার করে স্ব-বিরোধিতার সৃষ্টি করলেন তাঁরা। তাঁরা কেউই অগ্রসর হতে পারলেন না, এবং পূর্বেই যা উল্লেখ করেছি, তাঁদের সংস্কার কতকগুলি সংস্কারে পরিণত হল।

বিবাহবিধি, ধর্মমত ইত্যাদি সামাজিক ও নৈতিক প্রশ্নে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে সংস্কারবাদীরা যে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যাভিমানবশত বৃহত্তর জনসমাজ থেকে স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিলেন তা আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু এই বিচ্ছেদ আরো তীব্র এমনকি তিক্ত করে তুলেছিল, কেশবচন্দ্রের ও তাঁর অনুগামাদের রাজনৈতিক মতামত। সন্দেহ সেই যে, ব্রাহ্ম সামাজিক প্রশ্নে যাঁরা কেশবচন্দ্রের পক্ষভুক্ত ছিলেন না, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী ও দ্বারিকামোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি সেই সব সংস্কারবাদীরা, তাঁর রাজনৈতিক মতামতও গ্রহণ করেন নি। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, জনসমাজে দলনেতা হিসেবে কেশবচন্দ্র-ই সংস্কারবাদীদের মুখপাত্র হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং সেই জনসমাজ বহুলাংশে শিক্ষিত ছিল না, সচেতন ছিল না। এবং কতকাংশে ছিদ্রান্বেষী ছিল। ঔপনিবেশিক মধ্যশ্রেণীর প্রতিভূ হিসেবে কেশবচন্দ্র সম্ভবত সচেতন ছিলেন যে ইংরেজ রাজত্বের ফলেই তাঁদের সৃষ্টি ; দেশের জনজীবনের সঙ্গে কোন যোগ তাঁদের নেই ; পরন্তু নানা মত, গোষ্ঠি ও সম্প্রদায়-বিভক্ত জনসমষ্টির সম্বন্ধে বিচ্ছিন্ন ও নগরকেন্দ্রিক একটি গোষ্ঠির দলপতি হিসেবে তাঁর একটা অনাস্থা ছিল মনে হয়। এবং খৃষ্টধর্মের ভগীরথ হিসেবে ইংরেজের প্রতি কৃতজ্ঞতাও ছিল। ইত্যাকার নানা কারণে দেখি যে, তিনি আজীবন, 'ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্ব ঈশ্বরের মঙ্গল বিধান' এই মত উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে গিয়েছেন। ১৮৬৬-র বক্তৃতায় যে মত

ভাবময়তার সঙ্গে বিবৃত হয়েছিল, পরবর্তী দশকে রাজনৈতিক সঙ্কট যখন তীব্র হয়ে উঠেছে, তখন সে মত পরিত্যক্ত হল না, বরং আরো দৃঢ়, আরো মুখর হল। ১৮৭৬-এ লর্ড লীটনের মানবতা ও জনমত বিরোধী দরবার-অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন তিনি এবং ঘোষণা করলেন যে, রাণী ভিক্টোরিয়া যে ভারতের সাম্রাজ্ঞী, তাও ঈশ্বরের মঙ্গলবিধান। ১৮৭৫-৭৬-এ যুবরাজের ভারত ভ্রমণকে অত্যুৎসাহের সঙ্গে স্বাগত জানালেন এবং দেশীয়দের মেলামেশার জন্যে ঐ বৎসরেই যে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন, তার নামকরণ করলেন: Albert Institute,...in Commemoration of Royal Highness the Prince of Wales' visit to British India.... বাইবেলের ভাষা গ্রহণ করে ১৮৭৯-র ১৪ই ডিসেম্বর, 'ইনডিয়ান মিরর' মারফত তিনি যেভাবে ঈশ্বরের ভনিতায় রাণী ভিক্টোরিয়াকে বিধাতৃনির্দিষ্ট সাম্রাজ্ঞী বলে গ্রহণ করার জন্যে ভারতবাসীকে বিধান দেন, তা পাঠ করলে এই সময়ের ব্যবধানেও স্তম্ভিত হতে হয়। ৫০ সমাজনীতির ক্ষেত্রে যে আদেশবাদ তাঁর নিজ

৫০। Proclamation

To all my soldiers in India.

Accept this proclamation, believe that it goeth from Heaven in the name and with the love of your mother and carry out its behests like loyal Soldiers and devoted Children.

I have chosen India to show unto all nations the workings of my special providence in accomplishing National redemption. The British Government is my Government; the Brahma Samaj is my Church. All the evils in each are human and shall call forth my chastisement, but the essence of each is divine and is mine. I have sent the British nation to prepare the way, and have established the Brahma church to build my house in India. My daughter Queen Victoria have I ordained and set over the Country to rule its people, and give them education, material Comfort and protect their health and property. Be loyal to her..... Love her and honour her as my servant and representative, and give

গোষ্ঠির মধ্যে গণতান্ত্রিক ভাবনার কণ্ঠরোধ করেছিল ও বিচ্ছেদ সৃষ্টি করেছিল, তা রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রসারিত ও প্রযুক্ত হয়ে সংস্কার-বাদীদের রাজনীতি-সচেতন বৃহত্তর শিক্ষিত সমাজের থেকে, বিশেষত যুবকদের থেকে, গভীর ভাবে বিচ্ছিন্ন করেছিল। এই বিচ্ছেদের প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসে চিরকালের মত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই সমাজবিচ্ছিন্ন, জনবিরোধী, পরমুখাপেক্ষী সংস্কারকের প্রতিনিধি হিসেবে, পানুবাবুও সাহিত্যে অবাঞ্ছিত অমরতা অর্জন করেছেন।

সমাজনীতির ক্ষেত্রে যাঁরা পূর্বেই স্বীয় সমাজের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘোষণা করেছিলেন, রাজনীতির ক্ষেত্রেও যখন তাঁরা স্বদেশের ভাবনা-বেদনা অস্বীকার করে পরশাসনকে স্বাগত জানালেন, তখন উচ্চবর্ণের শিক্ষিত জাতীয়তাবাদীরা যে তাঁদের ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে স্বাজাত্যাভিমানবশত দেশীয় প্রচলিত রীতি-নীতির দিকে ঝুঁকে পড়লেন, তাতে সম্পূর্ণ বিস্মিত হওয়া যায় না। ধর্মপ্রীতি নয়, স্বাজাত্যাভিমান, স্বজাতি-প্রীতি এবং বৃহত্তর জনজীবনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের আকাংক্ষাই, তাঁদের প্রচলিত রীতি-নীতি, আচার ও সংস্কারকে দেশীয় বলে অভিনন্দন করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই যুগ-সন্ধিকালের বিশিষ্ট বেদনা প্রকাশ করতে হলে আবার আমাকে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র আশ্রয় নিতে হবে। "গোরা যে ত্রিবেণীতে স্নান করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে তাহার কারণ এই যে সেখানে অনেক তীর্থযাত্রী একত্র হইবে। সেই জনসাধারণের সঙ্গে গোরা নিজেকে এক করিয়া মিলাইয়া দেশের একটি বৃহৎ প্রবাহের মধ্যে আপনাকে সমর্পণ করিতে ও দেশের হৃদয়ের আন্দোলনকে আপনার হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে চায়। যেখানে গোরা একটুমাত্র অবকাশ পায় সেইখানেই সে তাহার সমস্ত সঙ্কোচ, সমস্ত পূর্ব্ব সংস্কার সবলে পরিত্যাগ করিয়া

her your loyal support and cooperation so that she may carry out my purposes unhindered and give India political and material prosperity. (*Life & works of Brahmananda Keshav, Compiled by Dr. Premsundar Basu, Navavidhan Publication Committee, 1940. P. 371*)

দেশের সাধারণের সঙ্গে সমান ক্ষেত্রে নামিয়া দাঁড়াইয়া মনের সঙ্গে বলিতে চায়, "আমি তোমাদের, তোমরা আমার"। ৫১

রবীন্দ্রনাথের গোরা, উপন্যাসের নায়ক, এবং মহৎ উপন্যাসের মহৎ নায়ক। কাজেই সে তার প্রাথমিক ভাবাবেগ নিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেনি, জনসংযোগের প্রয়োজনে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গিয়েছিল, দেখেছিল নীলকর ও গভর্ণমেণ্টের সম্মিলিত পীড়নে কৃষক শ্রেণীর দুর্গতি এবং সেই দুর্গতির ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক পার্থক্যের মূল্যহীনতা। তার চোখে পড়ল, "ভদ্রসমাজ, শিক্ষিত সমাজ ও কলিকাতা সমাজের বাহিরে আমাদের দেশটা যে কিরূপ…। এই নিভৃত প্রকাণ্ড গ্রাম্য ভারতবর্ষ যে কত বিচ্ছিন্ন কত সংকীর্ণ কত দুর্ব্বল; সে নিজের শক্তি সম্বন্ধে যে কিরূপ নিতান্ত অচেতন এবং মঙ্গল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন; প্রত্যেক পাঁচ সাত ক্রোশের ব্যবধানে তাহার সামাজিক পার্থক্য যে কিরূপ একান্ত; পৃথিবীর বৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্রে চলিবার পক্ষে সে যে কতই স্বরচিত ও কাল্পনিক বাধায় প্রতিহত; তুচ্ছতাকে যে সে কতোই বড়ো করিয়া জানে এবং সংস্কারমাত্রেই যে তাহার কাছে কিরূপ নিশ্চলভাবে কঠিন; তাহার মন যে কতই সুপ্ত, প্রাণ যে কতই স্বল্প, চেষ্টা যে কতই ক্ষীণ, তাহা গোরা গ্রামবাসীদের মধ্যে এমন করিয়া বাস না করিলে কোনো মতেই কল্পনা করিতে পারিত না।" ৫২ এবং এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বলে, প্রচলিত হিন্দুত্বকে আশ্রয় করে যে জাতীয়তাবাদকে সে গ্রহণ করেছিল, তার নৈতিক শূন্যতা স্পষ্ট হল তার কাছে। সে উপলব্ধি করল,…"যে ধর্ম্ম সেবারূপে, প্রেমরূপে, করুণারূপে, আত্মত্যাগরূপে এবং মানুষের প্রতি শ্রদ্ধারূপে সকলকে শক্তি দেয়, প্রাণ দেয়, কল্যাণ দেয়, কোথাও তাহাকেও দেখা যায় না—যে আচার কেবল রেখা টানে, ভাগ করে, পীড়া দেয়, যাহা বুদ্ধিকেও কোথাও আমল দিতে চায় না, যাহা প্রীতিকেও দূরে খেদাইয়া রাখে, তাহাই সকলকে চলিতে

৫১। গোরা, চতুর্থ বিশ্বভারতী সংস্করণ, ১৩৩৪ সাল, পৃঃ ৪৪।

৫২। ঐ, পৃঃ ২০৩।

ফিরিতে উঠিতে সকল বিষয়েই কেবল বাধা দিতে থাকে। পল্লীর মধ্যে এই মূঢ় বাধ্যতার অনিষ্টকর কুফল এত স্পষ্ট করিয়া এত নানারকমে গোরার চোখে পড়িতে লাগিল, তাহা মানুষের স্বাস্থ্যকে, জ্ঞানকে, ধর্ম্মবুদ্ধিকে, কর্ম্মকে এতদিকে এত প্রকারে আক্রমণ করিয়াছে দেখিতে পাইল যে, নিজেকে ভাবুকতার ইন্দ্রজালে ভুলাইয়া রাখা গোরার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল।" ৫৩

কিন্তু বাস্তবজীবনে, নয়া হিন্দুত্বে স্ফীত উচ্চবর্ণের মধ্যবিত্ত সন্তানেরা কেউই প্রায় গোরা ছিল না। প্রচ্ছন্ন বিদেশী ছিল না তারা। তাদের বিশেষ সুবিধাভোগী চরিত্রের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন ছিল না তাদের মনে, স্ব-জাতির উৎপীড়িত জনসাধারণের জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কোন বেদনাবোধও ছিলনা; কারণ সহমর্মিতাই অনুপস্থিত ছিল।

এই সব রমাপতি, মতিলাল ও অবিনাশের দল তাই, "এই সমস্ত দৃশ্যে ও ঘটনায় কিছুমাত্র বিচলিত হইত না.... ছোটলোকেরা তো এইরকম করিয়াই থাকে, তাহারা এমনি করিয়াই ভাবে, এই সকল কষ্টকে তাহারা কষ্টই মনে করে না; ছোটলোকেদের পক্ষে এরূপ ছাড়া আর যে কিছু হইতেই পারে তাহাই কল্পনা করা তাহারা বাড়াবাড়ি বলিয়া বোধ করে।" ৫৪ ইংরেজের চাকরি, ওকালতি ও জমিদারী-নির্ভর উচ্চবর্ণের শিক্ষিত তনয়দের দৃষ্টিতে পক্ষ বলতে শুধু তাঁরা, এবং বিপক্ষ ইংরেজ। ইংরেজের পীড়ন ও ব্যবস্থা তাঁদের অসহ্য ও অগ্রাহ্য কিন্তু তাঁদের পীড়ন যে দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের পক্ষে সমান অসহ্য ও ঐতিহাসিক বিচারে সমান অগ্রাহ্য এবং এক অত্যাচারের ভিত্তিতেই যে অপর অত্যাচারের স্থিতি, তা তাঁদের সংকীর্ণ চেতনায় স্বভাবতই প্রতিফলিত হয়নি। ফলে জাতীয়তার নামে, জাতীয় জীবনের পক্ষে একান্ত হানিকর প্রথা, রীতি-নীতি ও সংস্কার কয়েক দশক পরে আবার সদম্ভে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। নবযুগের প্রেরণা যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তা কালগ্রাসে পতিত হল বলা চলে।

৫৩। গোরা পৃঃ ৫৯০-৯১।

৫৪। ঐ, পৃঃ ২৪৪।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে, সংস্কারবাদীদের বৃহত্তর যে অংশ কেশবচন্দ্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক মত মানেন নি, 'ভারতসভা'র (১৮৭৬) প্রতিষ্ঠা যাঁরা করেছিলেন, তাঁরা তাঁদের দৃষ্টির সঙ্গে জাতীয়তাবাদের শুভসম্মিলন ঘটাতে পারলেন না কেন? টাকারমানের কাছে পত্রে রামমোহন যে প্রয়োজনবোধের কথা উল্লেখ করেছিলেন, (ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা দ্রষ্টব্য) সেই সুস্পষ্ট প্রয়োজনবোধকে দেশের মানুষের সামনে উজ্জ্বল করে তুলতে পারলেন না কেন? প্রশ্ন আরো এই জন্যে জাগে যে, এঁদের মধ্যে অনেকেই (আনন্দমোহন বসু, বা কৃষ্ণকুমার মিত্র) ব্যক্তিগতভাবে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে নেতৃত্ব করেছিলেন—কিন্তু দলগতভাবে স্বদেশী আন্দোলনের ভাবভিত্তি আদৌ প্রভাবিত করেছিলেন কি না সন্দেহ। সম্ভবত এর কারণ শুধু এই নয় যে, "কেশবচন্দ্রের সহিত ব্রাহ্মসমাজ লোকচক্ষে উঠিয়াছিল; তাহাকে নিরাশ হইয়া তাঁহার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সেই যে পশ্চাতে পড়িল আর উঠিতেছে না।" ৫৫

কারণ সম্ভবত এই যে, যে প্রশ্নে, এবং যে ভাবে সংস্কারবাদীরা শেষ পর্যন্ত বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হলেন, তাতে সর্বসাধারণের কাছে এবং তাঁদের নিজেদের কাছেও আপন নৈতিক নৈরাজ্য আর অগোচর রইল না। গোষ্ঠি হিসেবে যে তাঁরা প্রাচীন সমাজের দুর্বলতা ও ক্ষুদ্রতা থেকে অগ্রসর হন নি, তাঁদের যে সদর্থক বক্তব্য আর অবশিষ্ট নেই, সেইটাই সর্বসমক্ষে প্রমাণিত হল শুধু। ১৮৭৮-এ কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের চূড়ান্ত বিচ্ছেদের কারণ হল কুচবিহার বিবাহ। কেশবচন্দ্র সেন সরকারের আহ্বানে স্বীয় ঘোষিত মতের বিরুদ্ধে আপন নাবালিকা কন্যার সঙ্গে, কুচবিহারের সামন্ত রাজপরিবারের নাবালক যুবরাজের অব্রাহ্ম মতে বিবাহ দিয়ে অবশ্যই স্ব-বিরোধিতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে গভর্ণমেণ্টের অনুরোধের সঙ্গে ঈশ্বরের আদেশ একাকার করে ধর্মবুদ্ধিরও এক হতবুদ্ধিকর ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করেছিলেন, তাও

৫৫। শি. শা. আত্মচরিত : পৃঃ ২০০।

নিঃসন্দেহ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ধরণের একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সমাজকে বিচ্ছিন্ন করার দায়িত্ব নেয়াতে তাঁর বিরোধীপক্ষও প্রতিপন্ন করলেন যে, পূর্বতন গ্রামসমাজে, প্রাচীন প্রথাশাসিত ও জাতিভেদপীড়িত গোষ্ঠিগুলির মতো, তাঁরাও ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে সামাজিক অনুশাসন ও পীড়নকে সমাজে সমান উৎসাহে প্রয়োগ করেন। তাঁদের গঠিত সমাজের চরিত্রও, মূলত, প্রাক্তন সমাজের চেয়ে খুব স্বতন্ত্র কিছু নয়। এবং এই বিরোধ উপলক্ষে তাঁরা পরস্পরের দোষদর্শনে আত্মনিয়োগ করে, পরস্পরের যে রূপ সাধারণ্যে উদ্‌ঘাটিত করলেন, তাতে তাঁদের নৈতিক গুরুত্ব তথা তাঁদের বক্তব্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে দেশের সর্বসাধারণের সঙ্গে তাঁরা নিজেরাও আস্থা হারালেন। যদি কোন নীতিগত প্রশ্নে তাঁরা দলপতির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হতেন; ব্যক্তিস্বার্থের বিরুদ্ধে নয়, কোনও সুষ্ঠু সামাজিক বক্তব্যের সমর্থনে যদি নতুন গোষ্ঠি গঠন করতেন তাঁরা,—কেশব স্বয়ং এক দশক পূর্বে যা করেছিলেন—তাহলে তাঁদের একটা সদর্থক ভূমিকা থাকত, নৈতিক মর্যাদা লোপ না পেয়ে উন্নীত হত এবং তার ফল-স্বরূপ তাঁদের নিজেদের মধ্যেও ঐক্য থাকত। কিন্তু কোন সদর্থক ও নৈতিক প্রশ্নকে আশ্রয় করেন নি বলেই অতঃপর ইতিহাসে তাঁদের আর কোন দলগত গুরুত্ব রইল না। যাঁদের নিজেদের কোন সুস্পষ্ট নৈতিক ভিত্তি বা মূল্য নেই তাঁরা জনমানসকে প্রভাবিত করবেন কোন্ উপায়ে? বৃহত্তর জনসাধারণ দূরে থাক্ গণতান্ত্রিক সংগঠন পেয়ে সেই গণতন্ত্রকেও আত্ম-কলহের হাতিয়ার রূপে তুলে নিলেন তাঁরা। লক্ষহীন, বক্তব্যহীন গোষ্ঠি, স্বভাবতই ঐক্যহীন হল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শিবনাথ শাস্ত্রী তাই পরবর্তীকালে সখেদে লিখলেন, "যাঁহারা ইহার সভ্য হইলেন তাঁহাদের মনে নিরন্তর এই কথা জাগিল যে, ব্যক্তিগত প্রাধান্যে বাধা দেওয়াই এ সমাজের প্রধান কাজ, কর্ম্মচারীদিগের কাজের সহায়তা করা অপেক্ষা তাঁহাদের কাজের দোষ প্রদর্শন করা ও তাঁহাদের ব্যক্তিত্বকে সংযত করাই যেন সভ্যদিগের প্রধান কর্তব্য।···সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের

ভাব বলিলে সভ্যদিগের মধ্যে মতবিরোধ, দোষ প্রদর্শনেচ্ছা প্রভৃতি বুঝায়।" ৫৬

এই রকম একটি গোষ্ঠি, গোষ্ঠি হিসাবে বৃহত্তর ইতিহাসের ধারাকে প্রভাবিত করতে পারে না। পরন্তু ইতিহাস-ই তাঁদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে স্পষ্টত বলেছিল যে, তাঁরা, 'বারবার যাচাই হয়ে শূন্য প্রতিপন্ন হয়েছেন' (Have been weighted, weighted and found wanting.)।

বস্তুত লাল গোলাপ, সাদা গোলাপ ও হলদে গোলাপের মধ্যে যে এক ও অবিচ্ছিন্ন গোলাপ আছে, ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমস্ত পরস্পরবিরোধী আন্দোলনের পর্যালোচনা করলেও তেমনি একটি এক ও অবিচ্ছিন্ন ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে চোখে পড়ে। ধর্ম বা সমাজ-সংস্কার, জাতীয়তাবাদ বা সনাতন ধর্ম, সবকিছুকেই তাঁরা নিজেদের মাপে মাপসই করে এনেছেন। নতুনশিক্ষাও তাই জীবনে যুক্ত হয়নি। পুরনো জীবনের ওপর বাহ্যত আরোপিত হয়েছে শুধু। শতাব্দীর শেষ দশকে তাই দেশের শিক্ষিত সমাজের দিকে তাকিয়ে বিবেকানন্দকে বলতে হল, "কী কাপুড়ে সভ্যতাই ফিরিঙ্গি আনিয়াছে।" ৫৭ পাশ্চাত্য সভ্যতার সেই বহির্বাস যে কিভাবে পুরানো সমাজদেহে ও ভাবনায় আরোপিত হয়েছিল তার আংশিক পরিচয় নেবার জন্যে বঙ্কিমের পরিণত রচনার আলোচনা প্রয়োজন হবে।

কিন্তু পরিণত বঙ্কিমের রচনা ও মতামতের আলোচনার পূর্বে যুগভাবনার বিস্তৃততর পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন। যুগভাবনার সেই পরিপ্রেক্ষিত স্মরণে রাখলে রামকৃষ্ণ পরমহংসের একান্ত হিন্দু, ঈশ্বরমুখী জীবনদৃষ্টির সামাজিক তাৎপর্য অর্থবহ হয়ে ওঠে। নবযুগের পরিণতির পর রামকৃষ্ণের ধর্মভাবনার অভ্যুদয় অনেকেই বিস্ময়কর মনে করেছেন। ১৮৭৫-এর ২৮শে মার্চ, কেশবচন্দ্র সেন তাঁর *Indian Mirror* পত্রিকার

৫৬। শি. শা. আত্মচরিত: পৃ: ১৫৩।

৫৭। পত্রাবলী, প্রথমভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৬১, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃ: ৩০।

মারফত শিক্ষিত সমাজের কাছে রামকৃষ্ণের পরিচয় করিয়ে দেন। এর এগারো বৎসর পরে, ১৮৮৬-তে রামকৃষ্ণ পরমহংস-এর মৃত্যু ঘটে। ব্যাপকতর সমাজে তাঁর কার্য ও প্রভাব প্রধানত এই সময়েই বিস্তৃত হয়েছিল।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের অভ্যুদয়কে অনেকে হিন্দুত্বের বিজয়রূপে বর্ণনা করেছেন। ৫৮ এই মত সাম্প্রদায়িক। কারণ রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ থেকে রাজনারায়ণ পর্যন্ত কেউ-ই অহিন্দুত্বকে অভ্যর্থনা জানান নি। বলা যেতে পারে যে, এই মহান ধর্মসাধক প্রচলিত পূজা-পদ্ধতিগুলিকে মর্যাদা দিয়েছিলেন। সেটি সত্যভাষণ হবে। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, তিনি এ সবের-ই আপেক্ষিকতার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন; মূল্য দিয়েছিলেন ঈশ্বরমুখীনতাকে বা 'শুদ্ধা ভক্তি'কে।

রামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়বাদও অনেকে হিন্দুত্বের আশ্চর্য উদারতা ও মহিমার প্রকাশরূপে দাবী করেছেন।

কিন্তু হিন্দুধর্ম ও সমাজের বিচিত্র প্রকৃতি যদি স্মরণে রাখা যায় এবং সেই যুগে হিন্দু আচার ও বিশ্বাসগুলি যে প্রবল চাপের সম্মুখীন হয়েছিল সে কথা যদি বিস্মৃত না হই, তাহলে এই বিশিষ্ট মতটিকে হিন্দু সমাজের বিশেষ অনুকূল ও যুগোপযোগী বলে মানতে হবে। কারণ হিন্দুধর্মে ও সমাজে ধর্মান্তরকরণের কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে অন্য ধর্মসমাজের ক্ষেত্র থেকে মানুষকে এনে দলবৃদ্ধি করা হিন্দু সমাজের পক্ষে সম্ভব নয়। এই কারণে অন্য ধর্মকে অসত্য প্রমাণের কোন দায়ও হিন্দুর নেই। কিন্তু যে সব ধর্মে ধর্মান্তরকরণ সম্ভব, যাঁদের সুনির্দিষ্ট ধর্মমত বা *creed* বর্তমান, তাঁরা অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে নিজেদের সমমূল্য যদি স্বীকার করে নেন, তাহলে তাঁদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কোন সার্থকতা থাকে না।

৫৮। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে পরাজিত ও বিপর্যস্ত হিন্দু ভদ্রশ্রেণীর আত্মসান্ত্বনার প্রয়োজনে এ-দেশে রামকৃষ্ণের যে পুনরুত্থান ঘটেছে সে ঘটনার সঙ্গে উনিশ শতকের পরিপ্রেক্ষিত যেন একাকার না করা হয়। এই পুনরুত্থানের চেয়ে অগভীর আন্দোলন অতি অল্প-ই চোখে পড়ে। রামকৃষ্ণের বক্তব্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে কেবল তাঁর ব্যক্তিমহিমার স্তবস্তুতি ও সেই প্রসঙ্গে আত্মদৈন্যের বিজ্ঞাপনের কোন সদর্থক সামাজিক ভূমিকা নেই। আর তা নেই বলেই এই আন্দোলনের ফলে কোন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বা ধর্মপিপাসু, যুবক এগিয়ে আসে নি।

এবং সেইসব ধর্মমত যদি সম্প্রসারণশীল হয়, তাহলে তাঁদের অগ্রগতি স্বেচ্ছায় রোধ করতে হয়। এই সব কারণেই সম্ভবত যে সব ধর্মে ধর্মান্তরকরণ সম্ভব তাঁরা এ-মত মেনে নেন নি।

শিক্ষিত সমাজের নৈতিক, রাজনৈতিক এমনকি সমগ্র জীবনগত যে সংকট, তাও পরমহংসের কালেরই। তাঁদের ধর্মবিচার, তাঁদের সমাজ-সংস্কারের প্রেরণা, এ সব-ই তখন চড়ায় এসে ঠেকেছে। এবং রাজনৈতিক সংকট ধারণাতীত সমস্যার সৃষ্টি করেছে। আর্থিক জীবনও পরনির্ভরশীল ও সম্প্রসারহীন। সৃজনের কাছে নতুন কোন বক্তব্য আর নেই তাঁদের। এমতাবস্থায় রামকৃষ্ণের অভ্যুদয়, মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির ওপর কৃষক সংস্কৃতির জয় বলেই মনে হয়। রামকৃষ্ণের মধ্যে, তাঁর সামগ্রিক বক্তব্যের মধ্যে চোখে পড়ে কৃষক সংস্কৃতির শক্তি এবং তার দুর্বলতা, দুই-ই। একদিকে বিষয় ও বিষয়ীর প্রতি নিবিড় ঘৃণা, বিষয়-সর্বস্ব জীবন, তার বুদ্ধিবিচার, সব কিছুর প্রতি স্পষ্ট, প্রবল বিরাগ ও তাচ্ছিল্য; অন্যদিকে সমাজ জীবনের বৃত্তে যে সামাজিক জীবনের বিবিধ সমস্যার সমাধান সম্ভব, সে বিষয়ে আশ্চর্য ঔদাসীন্য, কিংবা শুধু তাই নয়, বিস্ময়কর অচেতনতা। প্রচলিত জীবনের আর্থিক, রাজনৈতিক এমন কি সামাজিক কাঠামোকেও প্রশ্নহীন ঔদাসীন্যে মেনে নেওয়া। যুবকদের মধ্যে যাঁরা প্রচলিত জীবনের নৈতিক ভিত্তিতে আস্থাহীন ছিলেন এবং সংস্কারবাদীদের অন্তঃসারশূন্যতা যাঁদের বিবেককে আশ্রয় দিতে পারে নি, স্বভাবতই তাঁরা রামকৃষ্ণের প্রভাবাধীনে এসেছিলেন। এবং নিজেদের জীবনসমস্যার সমাধান খুঁজেছিলেন সমগ্রভাবে সামাজিক জীবনকে অস্বীকার করে।

কিন্তু নবযুগের তাৎপর্য যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা নতুন সমাজ-ভাবনা ও দর্শনের মধ্যেই নিহিত ছিল। নবযুগের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তাই রামকৃষ্ণের বিশিষ্ট মতামতের চেয়েও দেশের যুবমনে বিবেকানন্দের প্রভাব ব্যাপক ও গভীর হয়েছিল। কারণ বিবেকানন্দ ধর্মীয় ধারণা ও আদর্শগুলির একটি ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক রূপ ও চরিত্র দিয়েছিলেন। শিবজ্ঞানে জীবসেবা হয়তো শাস্ত্রে ছিল—শাস্ত্রে কিনা আছে, বিশেষত এদেশ মীমাংসা দর্শনের দেশ, শ্রুতি-স্মৃতির মধ্যপথে

লোকশ্রুতির পরেই আমাদের নির্ভর। কিন্তু যা কর্মমাত্র ছিল, তাকে-ই ধর্ম বলে ঘোষণা করে ধর্মের ধারণাকেই নতুন চরিত্র দান করেছিলেন তিনি। বক্ষ্যমান আলোচনা বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় নয়, তাঁর প্রভাব ঈষৎ পরবর্ত্তী যুগের। তাঁর মতামতের সীমাও তাই এই আলোচনায় নির্দেশ করা চলে না। কিন্তু শ্রমের উর্ধ্বে গঠিত আশ্রম থেকে সেবাব্রত পরিচালনা করে নিষ্কাম কর্ম যে বহুলাংশে নিষ্ফল কর্মে পর্যবসিত হয়, ভারতবর্ষের পরবর্তী শতকের ইতিহাস থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। আপাতত তা আমাদের আলোচ্য নয়। শুধু সেই সময়ের দিকে তাকিয়ে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, তথাকথিত ভদ্রশ্রেণীর নৈতিক অন্তঃসারশূন্যতা ও পীড়নমূলক প্রকৃতি বিবেকানন্দ যতটা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন ও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছিলেন এমন আর কেউ করেননি। জনজীবনের দিকে এমনভাবে আর কেউ তাকান নি। আর বোধ করি সেই কারণেই, নবযুগের সমস্ত শিক্ষায় শিক্ষিত, এবং চিন্তায় সমৃদ্ধ যুবক নরেন্দ্রনাথ, গ্রামীন ভারতবর্ষের পরম্পরাগত ঐতিহ্যের কাছে আত্মনিবেদন করলেন এবং নিজেকে সমাজ-জীবনের সম্পূর্ণ বহির্ভাগে প্রতিষ্ঠা করলেন। পিতা বিশ্বনাথ দত্তের মৃত্যুর পর, ঔপনিবেশিক ভারতের রাজধানী কোলকাতার পথে পথে নিরন্ন ঘুরে ঘুরে, সমশ্রেণীর আত্মীয়দের দ্বারা প্রবঞ্চিত সেই আদর্শবাদী যুবক, তাঁর সমাজের, তাঁর শ্রেণীর, প্রকৃত চরিত্র মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। শুধু রামকৃষ্ণের অলৌকিক পাদস্পর্শ নয়, শেষ পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথ দত্তের সমাজসম্পর্ক ত্যাগের পশ্চাতে অত্যন্ত সজীব একটি সামাজিক কারণও ক্রিয়াশীল ছিল মনে হয়।

সাম্য থেকে ধর্ম্মতত্ত্বে বঙ্কিমের রূপান্তরের মধ্যবর্তী কালে বাংলার মধ্যবিত্ত-মানসও রূপান্তরিত হয়েছিল। ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির পরিবর্তে অতীতমুখীনতা, যুক্তিনির্ভরতাকে অস্বীকার করে বিশ্বাসপ্রবণতা, এবং আত্মবিশ্বাসের স্থলে অবতারবাদ, সমাজ-মানসে প্রবল হয়ে ওঠে। এক বিরুদ্ধ ও বিপরীত পরিবেশে উপায়হীন ঔপনিবেশিক মধ্যশ্রেণী অসম সংগ্রামে লিপ্ত ও পরিণামচিন্তায় ব্যাকুল। তাই সর্বত্র সন্ধান চলেছে ত্রাতার ; সবাই অন্বেষণ করে চলেছেন মুক্তির উপায়।

ধর্ম্মতত্ত্ব

বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিক মতামতের পূর্ণাঙ্গ বিচার করতে হ'লে ধর্ম্মতত্ত্ব ৫৯ (১৮৮৮ মে, প্রথম সংস্করণ) গ্রন্থটির বিস্তৃততর আলোচনা আবশ্যক। ধর্ম্মতত্ত্বে তাঁর শেষ বয়সের দার্শনিক মতামতের সম্পূর্ণ বিবৃতি পাওয়া যায়। অন্যান্য গ্রন্থের চেয়েও উক্ত গ্রন্থের মূল্য অধিক এই কারণ যে, ধর্ম্মতত্ত্বে যে অনুশীলন তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে, কৃষ্ণচরিত্র তারই শাস্ত্র থেকে সংগৃহীত উদাহরণ এবং দেবী চৌধুরাণী তারই সংসারে কল্পিত রূপ। এই মত স্বয়ং বংকিমের-ই। ৬০

ধর্ম্মতত্ত্বে বঙ্কিমের উদ্দেশ্য কি, সে বিষয়েও তিনি কোন অস্পষ্টতা রাখেন নি। উনিশ শতকে অর্জিত ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূত্রে লব্ধ সত্য বা ধারণাগুলির (কারণ সেগুলি সব সময়ে সত্য ছিল না) সংগে ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত হিন্দুধর্মের বোধ-বিশ্বাসগুলির সঙ্গতি প্রতিপন্ন করে হিন্দু আদর্শের নিত্যতা ও বুনিয়াদী হিন্দু সমাজ-সংগঠনের উৎকর্ষ প্রমাণ করা তাঁর লক্ষ্য ছিল। বঙ্কিমের নিজের ভাষায়ঃ

"আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির এমনকি শক্তি থাকিবার সম্ভাবনা যে, যাহা আর্য ঋষিগণ জানিতেন না—আমি তাহা আবিষ্কৃত করিতে পারি।...সমস্ত জীবন চেষ্টা করিয়া তাঁহাদিগের শিক্ষার মর্ম গ্রহণ করিয়াছি। তবে, আমি যে ভাষায় তোমাকে ভক্তি বুঝাইলাম, সে ভাষায়, সে কথায় তাঁহারা ভক্তিতত্ত্ব বুঝান নাই। তোমরা

৫৯। বর্তমান আলোচনায় ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থের সাহিত্য পরিষদ শতবার্ষিকী সংস্করণের ওপর নির্ভর করেছি। ধর্মতত্ত্ব থেকে উদ্ধৃতিগুলির কেবলমাত্র পৃষ্ঠা সংখ্যা এবং ক্ষেত্রবিশেষে অধ্যায় সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে।

৬০। আগে অনুশীলন ধর্ম পুনর্মুদ্রিত তৎপরে কৃষ্ণচরিত্র পুনর্মুদ্রিত হইলে ভালো হইত। অনুশীলন ধর্মে যাহা তত্ত্ব মাত্র কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট। আগে তত্ত্ব বুঝাইয়া,...তারপর উদাহরণের দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই উদাহরণ (কৃষ্ণচরিত্র...১ম সংস্করণ বিজ্ঞাপন)।

এবং দেবী চৌধুরাণী গ্রন্থে প্রফুল্লকুমারীকে অনুশীলনের উদাহরণ স্বরূপ প্রতিকৃত করা হইয়াছে (ধর্মতত্ত্ব পৃঃ ৪৪ পাদটিকা)।

উনবিংশ শতাব্দীর লোক, উনবিংশ শতাব্দীর ভাষাতেই তোমাদিগকে বুঝাইতে হয়। ভাষার প্রভেদ হইতেছে বটে কিন্তু সত্য নিত্য।" (পৃঃ ৬৪, ১১শ অধ্যায়)

এবং উনবিংশ শতাব্দীর 'ভাষা' তাঁকে পরিচ্ছদ স্বরূপ ধারণ করতে হলেও তাঁর মানসিক প্রবণতা ও মূল্যবোধ সম্পূর্ণ সনাতনী। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকে তা স্পষ্ট হবে।

"শিষ্য...হিন্দুর মধ্যে ভক্তি আছে; কিন্তু সে আর এক রকমের। প্রতিমা গড়িয়া তাহার সম্মুখে যোড় হাত করিয়া পট্টবস্ত্র গলদেশে দিয়া গদগদভাবে অশ্রুমোচন। হরি! হরি! মা, মা! মা! ইত্যাদি শব্দে উচ্চতর গোলযোগ, অথবা রোদন, এবং প্রতিমার চরণামৃত পাইলে তাহা মাথায়, মুখে চোখে, নাকে কাণে---

গুরু। তুমি যাহা বলিতেছ বুঝিযাছি। উহাও চিত্তের উন্নত অবস্থা, উহাকে উপহাস করিও না। তোমার হক্সলী টিণ্ডল অপেক্ষা ওরূপ একজন ভাবুক আমার শ্রদ্ধার পাত্র।" (পৃঃ ৯৮; ২০তম অধ্যায়)

পাশ্চাত্যজ্ঞান ও হিন্দুধর্মের সমন্বয় চেষ্টার প্রয়োজনে একদিকে Herbert Spencer এর (১৮২০-১৯০৩) ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ বা *Individualism*, Jeremy Bentham ও John stuart mill-এর (১৮০৬-১৮৭৩) হিতবাদ বা *utilitarianism* এবং August Comte এর (১৭৯৮-১৮৫৭) *Positivism* থেকে আহৃত মানবতাবাদের ওপর নির্ভর করেছিলেন; অন্যদিকে হিন্দুধর্মের সত্য সংগ্রহের জন্যে নির্ভর করেছিলেন মূলত ভগবদগীতা, ভাগবত ও পুরাণের ওপর। বেদ উপনিষদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল, কিন্তু তা তাঁকে আকৃষ্ট করেনি। বৌদ্ধধর্ম, বিশেষত বৌদ্ধদর্শন ও প্রমাণের ধারার সঙ্গে তাঁর পরিচয় যে গভীর ছিল, (যেমন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ছিল) তার পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না। লোকায়ত দর্শন স্বভাবতই তাঁর অপরিচিত ছিল। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণা, সেগুলি কতটা হিন্দুধর্মসঙ্গত তা তাঁর সমন্বয়ের বিচারে কিছুটা এসে পড়বে—তবু আরম্ভেই তাঁর ধারণাগুলির একটি

বিবৃতি দেওয়া প্রয়োজন কারণ তাঁর হিন্দুধর্ম কতটা বিচারসম্মত সে বিচারের আবশ্যকতা আছে।

ধর্ম্মতত্ত্বে, তিনি বিশ্বাস করেন ঃ

১। ঈশ্বর আছেন।

২। ঈশ্বর নিরাকার এবং অনন্ত।

৩। ঈশ্বর সগুণ। তাঁর প্রত্যেক গুণ এবং তিনি অনন্তগুণসম্পন্ন।

৪। ধর্ম ঐশিক নিয়মাধীন।

৫। বেদের, উপনিষদের ধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম কোনটিই সম্পূর্ণ নয়। এই তিনধর্মের সারভাগ নিয়ে গঠিত পৌরাণিক হিন্দুধর্ম-ই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ধর্ম এবং জাতীয় ধর্ম হবার উপযুক্ত। (২৭তম অধ্যায়, চিত্তরঞ্জনী বৃত্তি, পৃঃ ১৩৬-১৩৭)

১। ঈশ্বর সত্তা যে অপ্রমেয়, সাংখ্যের এই বিচারের দিকে তিনি দৃষ্টিমাত্র নিক্ষেপ করেন নি। যা অপ্রমেয়, তাকে সৎ-এর অন্তর্ভূক্ত করা যায় কি না, এবং তার ভিত্তিতে মানুষের বাস্তব জীবনে 'শীল' কি তা তা নির্দেশ করা যায় কি না, বৌদ্ধ চিন্তার এই মূল্যবান দিকটি তাঁর বিচারের অন্তর্ভূক্ত হয় নি।

২ ও ৩। নিরাকার অতএব অনন্ত ঈশ্বরের ধারনার সঙ্গে, সগুণ ঈশ্বরের ধারণার কতটা সঙ্গতি, সে প্রশ্ন তাঁর বিচারকে প্রভাবিত করে নি। কোন গুণকে কোন অবস্থায় অনন্ত বলা যায় কি না, বললে সেই গুণটি আর সেই বিশেষ অতএব নির্দিষ্ট ও সান্ত গুণ থাকে কি না, সে বিষয়েও তিনি সচেতন নন। কোন গুণবিশেষ যদি অনন্ত হয় তবে তা অন্য সব গুণকে আচ্ছন্ন করে কি না, তাও তাঁর চিন্তাকে প্রভাবিত করে নি। একাধিক গুণকে যদি অনন্ত আখ্যা দেওয়া যায় তবে একাধিক অনন্তকে মেনে নেওয়া হয় কি না, এবং অসঙ্গতির উদ্ভব হয় কি না, সে প্রশ্নও তাঁর মনে জাগে নি। এ ছাড়া যে সত্তা সর্বব্যাপক বা সর্বময় অতএব আমরা যার অংশ, এবং সেই কারণে যা আমাদের ধারণায়ত্ত নয় বা হ'তে পারে না, তার ওপর কোন মানবিক গুণ আরোপ করা কতটা যুক্তিসম্মত সে ভাবনাও তাঁর নেই।

সংক্ষেপে ঔপনিষদিক ধারনার সঙ্গে বৈষ্ণবী ভাবনার যে বিরোধ সে বিষয়ে তিনি অচেতন।

৪। ধর্ম যদি ঐশিক তবে তাঁর নিজের প্রতিপাদ্য অনুশীলন ধর্মকে দর্শন বা মতসমষ্টি আখ্যা না দিয়ে ধর্ম আখ্যা দান করে তিনি আত্মস্বরূপে ঈশ্বরত্ব আরোপ করেছেন কি না, এবং করলে সেটা বিচার-সম্মত হয়েছে কি না, সে বিষয়েও তিনি অচেতন। কপিল, পাতঞ্জল, কণাদ, জৈমিনি প্রভৃতি কেউ-ই স্ব স্ব বিচারকে সাংখ্য ধর্ম, যোগধর্ম বৈশেষিক ধর্ম কি মীমাংসা ধর্ম আখ্যা দেন নি। কারণ তা হলে ধর্মের উৎস-স্বরূপ অপৌরষেয় বেদকে (তা ঐশিক কি না স্বতন্ত্র) অস্বীকার করতে হয়। যা তাঁরই ব্যাখ্যা অনুযায়ী ঐশিক ধর্ম নয়, মত মাত্র, তাকে ধর্ম আখ্যা দান করলে সত্যের যে গুরুতর অতিরেক ঘটে, তা তাঁর বিচারকে প্রভাবিত করে নি।

দ্বিতীয়ত বৌদ্ধধর্মের মত যে ধর্ম ঐশিক নয়, তা কি, তাও তিনি উল্লেখ করেন নি।

৫। পৌরাণিক ধর্ম যদি বেদ, উপনিষদ ও বৌদ্ধধর্মের সারভাগ নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে, তবে তার মধ্যে সর্বধর্মনিন্দিত (এবং যে নিন্দা তিনিও করেছেন, ভক্তির আলোচনায়) কাম্য কর্মের অনুষ্ঠান এবং গৌণা ভক্তির প্রাবল্য কেন তা তিনি বলেন নি। তার মধ্যে বৈদিক ধর্মের অপরিমিত শক্তি ও প্রাণের আনন্দ, ঔপনিষদিক বিচারশীল আনন্দ এবং বৌদ্ধধর্মের বিচার, সংযম ও আত্মশাসন কোথায় তাও তিনি জানান নি।

তিনি নিজেও এই পৌরাণিক ধর্মের সীমিত মূল্য সম্বন্ধে অচেতন ছিলেন না। যথা:

"শিষ্য। কিন্তু পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মে আনন্দের কিছু বাড়াবাড়ি আছে সামঞ্জস্য নাই, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

গুরু। অবশ্য হিন্দুধর্ম্মে অনেক জঞ্জাল জমিয়াছে—ঝাঁটাইয়া সাফ করিতে হইবে। হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম যে বুঝিতে পারিবে, সে অনায়াসেই আবশ্যক ও অনাবশ্যকীয় অংশ বুঝিতে পারিবে।... (পৃঃ ১৩৭)

আশ্চর্য এই যে, শিষ্যের প্রশ্নের যে মূল যুক্তি, গুরুর উত্তরে তার কোন উত্তর নেই। প্রশ্ন এই যে, পৌরাণিক ধর্মের যে স্বীকৃত বিকৃতি-গুলি, সেগুলি তার স্বভাবজ না আরোপিত? তার মীমাংসা সর্বাগ্রে প্রয়োজন, কারণ ধর্মের বিকৃতি যদি সংশ্লিষ্ট ধর্মের স্বভাবজ হয়, তবে সেই ধর্মই বিকৃত বা বিকৃতির লক্ষণাক্রান্ত। যদি আরোপিত হয়, তবে প্রশ্ন ওঠে যে, সর্বাঙ্গসম্পন্ন ধর্মে তা কি ভাবে বা কোন্ সূত্রে আরোপিত হতে পারে, হয়েছে। আরোপিত হলেই বা তা কি ভাবে ও কেন গৃহীত হতে পারে, যদি তার অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে বিকারের সমর্থন না থাকে। এই সব প্রশ্নের সমাধান না করে কেবল আশাবাদী উক্তির দ্বারা সত্যে উপনীত হওয়া যায় না।

পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎস সম্বন্ধে বঙ্কিমের ধারনা যথেষ্ট স্পষ্ট ছিল। (দ্রষ্টব্য পৃঃ ১০৬)। উনিশ শতকের ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রনীতির প্রকৃতি সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন তিনি।

সম্ভবত সেই প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর হতাশাই তাঁকে বিশেষত নিক্ষেপ করেছিল ভারতের লৌকিক ধারণাগুলিকে সর্বাঙ্গসুন্দর প্রতিপন্ন করার দিকে। "··আজিকালি অনেক লোকে পরকালের ভয় পায় না,··· আজিকার দিনে বলিতেছি; কেন না, একসময়ে এদেশে সে ধর্ম্ম বড় বলবানই ছিল বটে। এক সময়ে ইউরোপেও বড় বলবান ছিল বটে, কিন্তু এখন বিজ্ঞানময়ী ঊনবিংশ শতাব্দী। সেই রক্ত-মাংস-পূতিগন্ধ শালিনী, কামান-গোলা-বারুদ-ব্রীচলোডর-টর্পীডো প্রভৃতিতে শোভিতা রাক্ষসী—এক হাতে ঝাঁটা ধরিয়া, যাহা প্রাচীন, যাহা পবিত্র, যাহা সহস্র সহস্র বৎসরের যত্নের ধন, তাহা ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিতেছে। সেই পোড়ারমুখী এদেশে আসিয়াও কালামুখ দেখাইতেছে। তাহার কুহকে পড়িয়া তোমার মত সহস্র সহস্র শিক্ষিত, অশিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালী পরকাল আর মানে না।··· (পৃঃ ৩১-৩২, ৭ম অধ্যায়, সামঞ্জস্য ও সুখ)।

লক্ষনীয় এই যে, তাঁর কাছে উনিশ শতকের বিজ্ঞানের সঙ্গে উনিশ শতকের সাম্রাজ্যবাদ ও জঙ্গীবাদ সমার্থক হয়ে গেছে, যদিও বিজ্ঞানের

চর্চা যখন ছিলনা তখনও যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদ ছিল, এবং 'সহস্র সহস্র বৎসরের পুরাতন ধন' পরকালের ধর্মের জন্যে অমানুষিক অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা তখনও অনুষ্ঠিত হয়েছে। অথচ বিজ্ঞানময়ী উনবিংশ শতাব্দী মানুষের জীবনসমস্যার কোন সমাধান করতে পারল না এটা নিরীক্ষণ করেই অন্য অনেকের মত বঙ্কিমকেও, সহস্র সহস্র বৎসরের পুরাতন মত, বিশ্বাস ও ধারণা সমূহের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করতে হয়েছে। সর্বাপেক্ষা ব্যাপার বেদনার এই যে, ১৮২৩-এ যে দেশে রামমোহন নতুন জ্ঞানকে স্বাগত জানান, বিদ্যাসাগর কর্মজীবনে যার পূর্ণ সমর্থন করেন, সেই নতুন জ্ঞান উনবিংশ শতকের শেষ দশকের সূচনায় বাংলার শিক্ষিত সমাজের অগ্রগণ্য প্রতিনিধির কাছে 'কুহক' রূপে প্রতিভাত হল।

পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎসমূল সম্বন্ধে চেতনা সত্ত্বেও রাজনৈতিক কারণে পশ্চিম সম্বন্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া এবং ঔপনিবেশিক জীবনের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিহীন অতীতমুখীনতাবশত ও উনিশ শতকের ইংরেজী ভাবনার সঙ্কীর্ণতাবশত (এদেশে স্বভাবতই তার রূপ আরো অনেক সঙ্কীর্ণ হয়েছিল) বঙ্কিম পাশ্চাত্য জ্ঞানের যে পরিচয় ধর্ম্মতত্ত্বে অঙ্গীকার করেছেন তাকে সঙ্কীর্ণ বলতেই হবে। St. Thomas Acquinas ও Dante-এর রচনায় যে পারম্পরিক সঙ্গতিসম্পন্ন খৃষ্টীয় জীবনবোধ পরিস্ফুট, তা ইয়োরোপে, বিশেষত ক্যাথলিক দেশগুলি থেকে কখনো মুছে যায় নি। এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার বিচারে সেই চিন্তার পরিচয় নেওয়া আবশ্যিক। খৃষ্টধর্মের সঙ্গে এ্যাংলিকান চার্চকে সমার্থক জ্ঞান করলে, ইয়োরোপীয় সভ্যতা ও তার সঙ্গে খৃষ্ট ধর্মের যে সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়, তা যথার্থ নয়। এই কারণে বঙ্কিম ইয়োরোপীয় সভ্যতার প্রকৃতি সম্বন্ধে যা বলেছেন তা অর্দ্ধসত্য মাত্র। বিশেষত খৃষ্টধর্মের তুলনায় সনাতন হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে গিয়ে যা লিখেছেন তাকে সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করতে গিয়ে তিনি বলছেন:

"For religion, the ancient Hindu had no name, because his conception of it was so broad as to

dispense with the necessity of a name. With other **peoples** religion is only a part of life, there are **things** religious and there are things lay and secular. **To** other peoples, their relations to God and to the **spiritual** world are things sharply distinguished **from** their relations to man and to the temporal **world.** To the Hindu, his relations to God and his **relations** to man, his spiritual and his temporal **life** are incapable of being so distinguished. They **form** one compact and harmonious whole to **separate** which into its component parts is to break **the** entire fabric. All life to him was religious···
(পৃঃ ১৪৬ ক্রোড়পত্র খ। আরো তুলনীয়, পৃঃ ২২)

কিন্তু পার্থিব বা temporal ও আধ্যাত্মিক বা spiritual, এতদুভয়কে এক করে দেখা, এবং শুধু দেখা নয়, একই ধর্মীয় অনুশাসনে শাসিত করা, হিন্দুধর্মের চেয়েও মধ্যযুগীয় খৃষ্টান ধর্মে অনেক বেশী করা হয়েছিল। ইতিহাসে দেখা যায় (তত্ত্বগ্রন্থে নয় বাস্তবে) যে, মধ্যযুগের খৃষ্টান ধর্মের চেষ্টা ছিল মানুষের সমগ্র জীবনবিন্যাসকে খৃষ্টান চার্চের অধীনে আনা। রাজারা চার্চের অধীন ছিলেন। পোপের আদেশ অমান্য করার অধিকার বা সাধ্য, সম্রাটেরও ছিল না। কিন্তু শুধু তাই নয়, মানুষের সমগ্র আর্থিক জীবনকে খৃষ্টধর্মের আওতায় সুনির্দিষ্টরূপ দেবার যে প্রণালীবদ্ধ প্রচেষ্টা চোখে পড়ে, হিন্দুধর্মের ইতিহাসে তা দুর্লভ। কারণ বোধ হয়, খৃষ্ট ধর্মের চার্চের সঙ্গে তুলনীয় সংগঠন হিন্দুধর্মের ছিল না। usury (সুদ নেওয়া) রোধ করা এবং সর্বত্র just price বা উচিত মূল্য যাতে রক্ষিত হয় তা দেখা, মধ্যযুগীয় খৃষ্টানীর প্রধান কর্তব্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ বিষয়ে সুকঠোর বিধি, অনুশাসন এবং নানা দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে বিচারের নজীর, খৃষ্টানীর ইতিহাস ও ইউরোপীয় অর্থনীতির ইতিহাসের পাতা জুড়ে আছে। এর তুলনীয় কোন

প্রচেষ্টা হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে না। সংস্থা ত' নয়-ই। বস্তুত প্রাচীন হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য এই যে, তা মধ্যযুগীয় খৃষ্টানীর মত বা পরবর্তী স্মার্ত ব্রাহ্মণ শাসিত হিন্দুধর্মের মত সর্বগ্রাসী ছিল না। ইউরোপে রিফরমেশন ও রেনেসাঁস থেকে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও স্বাধীন চিন্তার শুরু হয়। পরে বাণিজ্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের শিকড় শিথিল হয়ে নতুন আর্থিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে। ফলে মানুষের পার্থিব জীবনের বিভিন্ন দিকেই চার্চের শাসনের বাইরে ধর্মনিরপেক্ষ (secular) নিয়ম ও বিধি প্রাধান্য পেতে থাকে। প্রাচীন হিন্দুসমাজেও দেখি যে, জীবনের সর্বত্র-ই মনুস্মৃতিই একমাত্র গ্রন্থ নয়। রাজ্যশাসনে চাণক্যের অর্থশাস্ত্র বিজ্ঞজন নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন। ব্যক্তি-জীবনে বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র। প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থাতেও এইসব বিষয় পাঠ্য ছিল; শুধু ধর্মশাস্ত্র নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন না তাঁরা; বস্তুত পার্থিব ও আধ্যাত্মিক কে একাকার করে দেখা হিন্দু-জীবনে সেই সময় থেকে শুরু হয়েছে, যখন হিন্দু পার্থিব জগতের ওপর থেকে কর্তৃত্ব হারিয়ে কমঠ-কবচের অন্তরালে আত্মগোপন করেছে। বহির্জগতের ওপর কর্তৃত্ব হারিয়েছে এবং তার সংগে হারিয়েছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, চূড়ান্ত ক্ষমতা, ক্ষমতার কেন্দ্র বা সংস্থা এবং বহির্জগতের ওপর আধিপত্য। ফলে উদ্ভূত হয়েছে কমঠ-কবচ, বিশ্ববিমুখ বিধি-নিষেধ, গার্হস্থ্য-সর্বস্ব জীবনধারা। ইংরেজের অভিঘাতে এই প্রাচীন গ্রামসমাজ ভেঙে যাওয়ার ফলে প্রাচীন রীতি-নীতিরও পরিবর্তন আবশ্যক হয়ে পড়ে। নবযুগের প্রারম্ভে, বিশেষত রামমোহনের মধ্যে এই পরিবর্তনের প্রয়োজন-চেতনা খুব স্পষ্ট ৬১। এবং রামমোহনের ধর্মসংস্কারের

৬১। Letter dt. 18 January 1828, to Dr. Tuckerman.

I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interests. The distinction of castes introducing innumerable divisions & sub-divisions among them has entirely deprived them of patriotic feeling and the multitude of religious rites and ceremonies and the laws of purification have

প্রেরণা কতটা সামাজিক প্রয়োজনবোধ-সম্ভূত, তারও বিচার প্রয়োজন। পার্থিব ও আধ্যাত্মিক এতদুভয়কে একাকার করে তোলা কাণ্ডজ্ঞানসম্মত নয়, প্রাচীন হিন্দুনীতিসম্মতও নয়। সেটা পরবর্তী স্মার্ত ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজের কীর্তি, উনিশ শতক পর্যন্ত যার স্থায়িত্ব আমাদের গভীরতম দুর্গতির মূল। এবং উনিশ শতকের শেষ কয় দশকে উচ্চশ্রেণীর জাতীয়তাবাদ বা আত্মগৌরবের প্রেরণায় সেই ব্যবস্থাকে প্রাচীন ভারতের ওপর আরোপ করাও উচ্চ কোটির জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক দুর্গতি বলে মনে হয়। এই অতীতমুখী আত্মাভিমান ও অনৈতিহাসিক সমাজতত্ত্ব, বঙ্কিম ও কিয়দংশে ভূদেবের প্রেরণায় সুষ্ঠু মতাদর্শের আকার নেবার পর, স্বদেশী আন্দোলন পর্যন্ত সমস্ত বাঙালী চিন্তানায়কের চিন্তাকেই প্রভাবিত করেছিল—এমনকি সাময়িকভাবে রবীন্দ্রনাথকেও।

খৃষ্টধর্ম ও পাশ্চাত্য সমাজনীতি সম্বন্ধে বঙ্কিমের মত ইতিহাস-সম্মত ছিল না, কিন্তু সেটাই সব নয়। পাশ্চাত্য জ্ঞান বলতে তিনি যার ওপর নির্ভর করেছিলেন তাও বিশেষত খণ্ডিত ছিল। পূর্বেই (সাম্যের যুগে) দেখি যে, রুশোর আবেগময় বিচারের ওপর তিনি যতটা নির্ভর করেছিলেন, ভলতেয়র, দিদেরো, হলবাখ প্রভৃতি যুক্তিবাদী শিক্ষাগুরুদের প্রশ্ন, তর্ক, সমালোচনা ও বিচারের প্রতি তাঁর তদনুরূপ মনোযোগ ছিল না। মনে করা যেতে পারে যে, সেদিকে যদি তিনি যথেষ্ট মনোনিবেশ করতেন, তাহলে তাঁর পক্ষে এ-কথা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হত যে, 'সহস্র সহস্র বৎসরের পুরাতন বন', 'পরকালের ধর্ম' ইত্যাদিকে যা 'ঝাটাইয়া ফেলিয়া দিতেছে', তা উনিশ শতকের 'কামান-গোলা-বারুদ-ব্রীচলোডর-টর্পীডো' প্রভৃতি নয়, তার পূর্ববর্তী অষ্টাদশ শতকের চিন্তা, যার মূলে ছিল তারও পূর্ববর্তী শতকের বিজ্ঞানবিশেষের পদ্ধতি। আমি স্যর আইজাক নিউটনের পদ্ধতির কথা বলছি। স্বয়ং নিউটনের কথা নয়—

---

totally disqualified them from undertaking any difficult enterprise……it is I think necessary that some change should take place in their religion at least for the sake of their political advantage and social comfort. (অংশত উদ্ধৃত)

কারণ মতামতের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত রহস্যময় বহুধাবিভক্ত ছিলেন। ৬২। অন্যপক্ষে জার্মান দার্শনিক চিন্তার সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাত পরিচয়ের অভাব স্পষ্ট এবং এই অপরিচয় তাঁর চিন্তাকে দুর্বল করেছিল মনে হয়। প্রাচীন গ্রীস ও ভারতের ঐতিহ্য-সম্মত এবং হেগেলের রচনায় সুদৃঢ় প্রণালীবদ্ধ Dialectical পদ্ধতির সঙ্গে যদি তিনি পরিচয় গভীরতর করতেন, তাহলে দেশ-কাল ও অবস্থা-নিরপেক্ষ, অনড়, অবিচল ও অব্যয় সামঞ্জস্যের ধারণা (যে বিষয়ে পরে বিস্তৃততর আলোচনা করা হবে) সম্বন্ধে তাঁর নিজের মানসে কতকগুলি প্রশ্নের সম্মুখীন না হয়ে তিনি পারতেন না। এবং তাঁর রচনায় প্রতি পদে Real (বাস্তব) ও ideal (ভাব) সংক্রান্ত যে সব ক্যাটেগোরির বিপর্যয় (Confusion of Categories) চোখে পড়ে (যার আংশিক আলোচনা ক্রমশ করা হবে), তাও সম্ভব হত না, যদি তিনি ইমানুয়েল কাণ্টের বিচারপদ্ধতি সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত হতেন।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রাচ্য (যা ভৌগোলিক অর্থে কখনও পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য নয়) বোধ সম্বন্ধে সমন্বয়-চেষ্টার আলোচনায় আরো একটি সত্য স্মরণে রাখা প্রয়োজন। বিজ্ঞান-এর বৈজ্ঞানিকতা কোনও তত্ত্বে বা মতামতে নিহিত নেই বা নয়। বিজ্ঞানের প্রাণ তার পদ্ধতিতে। পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও তার ভিত্তিতে উপনীত সিদ্ধান্ত, মূলত এই হল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এ ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্ত-ই চূড়ান্ত নয়। নতুন তথ্যের সম্মুখীন হলে, নতুন কিছু পর্যবেক্ষণ করে, নতুন পরীক্ষার ফলে, বিজ্ঞানী পুরনো সিদ্ধান্তকে বাসাংসি জীর্ণানির মতো-ই পরিত্যাগ করেন। বিজ্ঞানের সত্য আর বৈজ্ঞানিক মত বা তত্ত্ব তাই এক নয়। সেই কারণেই কোনও এক সময়ে যা বিজ্ঞানসম্মত মত বা তত্ত্ব বলে পরিচিত বা গৃহীত, তার সঙ্গে অবিচল বা অব্যয় ধর্ম-

---

৬২। নিউটনের ব্যক্তিগত মতামতের জটিলতার সঙ্গে পরবর্তী শতকের যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞানবাদ যা নিউটনের পদ্ধতির সৃষ্টি,—এক নয়। দ্রষ্টব্য: *The Royal Society, Newton tercentenary celebration, 15—19 July 1946, Published for Royal Society, University Press, Cambridge, 1940.* বিশেষত Lord Keynes ও S. I. Vavilov-এর প্রবন্ধ।

তত্ত্বের সমীকরণ করা হলেও, তার দ্বারা বিজ্ঞান ও ধর্মের সামঞ্জস্য করা হয় না। কারণ, উভয়ের লক্ষ্যের ও পদ্ধতির পার্থক্য। ধর্মের সত্য চর্যাসাপেক্ষ, আত্মচর্যাসাপেক্ষ ; বিজ্ঞানের মতো চর্চাসাপেক্ষ, বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে চর্চাসাপেক্ষ নয়। চর্যা ছাড়াও সত্যে উপনীত হওয়া সম্বন্ধে ধর্মবাদীদের পদ্ধতি স্বতন্ত্র। পরিপ্রশ্ন, প্রণিপাত ও সেবার দ্বারা, গুরুকে সন্তুষ্ট করে, শম দম ও তিতিক্ষার সাহায্যে চিত্তশুদ্ধি করে, স্মরণ মনন ও নিদিধ্যাসন যোগে যে সত্যে উপনীত হওয়া যায়, তা যদি কোন সময়-বিশেষে প্রচলিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঙ্গে সমার্থক হয়ও, তবু তা বৈজ্ঞানিক হবে না। কারণ সে সত্যকে নির্ণয় করা, বিচার করা বা যাচাই করার পথ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিজ্ঞান ও ধর্মের সামঞ্জস্য প্রমাণ করার জন্যে তাই অদ্যাবধি যত চেষ্টা করা হয়েছে, তাকে পণ্ডশ্রমের প্রকারভেদ বলা চলে। এ-জাতীয় চেষ্টায় বিজ্ঞানের কোনও উন্নতি ঘটে না, বরং ধর্মের মহিমা খর্ব হয়। কারণ ধর্মের লক্ষ্য এক ধরণের চিত্ত-প্রকর্ষ, বিশেষ এক ভাবে আত্মগঠন। সমস্ত প্রয়োজনের বাইরে যাবার যে গভীর প্রয়োজন মানুষ দেশে-কালে উপলব্ধি করে, তার-ই প্রেরণায় বিশেষ ভাবে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ করে মানুষ বিশেষ একটা স্তরে নিজেকে উপনীত করতে চায়—যাকে মুক্তি, মোক্ষ, নির্বাণ যা-ই বলা হোক না কেন। ধর্মের পদ্ধতি স্বভাবতই সেই প্রয়োজন বা প্রেরণার সূত্রে উদ্ভূত। বিজ্ঞানী আত্মনিরপেক্ষ ভাবে বিশ্বব্যাপারের প্রকৃতি-পরিচয় নিতে চান। তাঁর পদ্ধতিও সেই প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে। দেখা গেছে যে, বিভিন্ন ধর্মে, বহির্বিশ্বের গঠন ও প্রকৃতি এবং প্রজাতির উদ্ভব সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, তা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার সাহায্যে সেইসব বিষয়ে যে সব নির্ণেয় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়---তার থেকে আলাদা। এবং অভিজ্ঞতা-লব্ধ সত্যকে যদি আমরা সত্য বলে স্বীকার করি, তাহলে সত্য নয়। অন্যপক্ষে মুক্তি, মোক্ষ, নির্বাণ বা ঈশ্বর সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কেউ-ই সুনির্দিষ্ট কিছু বলতে পারেন না। কারণ মুক্তি, মোক্ষ, নির্বাণ বা ঈশ্বর, সামনে পড়ে নেই, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বা মেধার প্রয়োগে তার

সামীপ্য সম্ভব নয়, স্বভাব-নিরপেক্ষ ভাবে তার পরীক্ষা করা যায় না। ফলে সে সম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তেও উপনীত হওয়া যায় না। এক্ষেত্রে আপন প্রবণতা ও মানসিক প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোন ব্যক্তিই নিজের পথ বেছে নিতে পারেন, কিন্তু এতদুভয়কে একাকার করা বা করার চেষ্টা করা, আত্মিক অপচয় ছাড়া আর কিছু হবে না। বঙ্কিমের প্রচেষ্টার বিস্তৃততর আলোচনার পূর্বে এই চেষ্টার সীমিত মূল্য সম্বন্ধে তাই অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু যুক্তির বিচারে সীমিত হলেও এই গ্রন্থটি উনিশ শতকের শেষ দশকে এবং প্রায় প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা পর্যন্ত বাংলার শিক্ষিত হিন্দু ভদ্র শ্রেণীর চিন্তাকে যে প্রভাবিত করেছিল. তাও অকারণে নয়। উনিশ শতকের ভাষাই নয় শুধু, উনিশ শতকের আত্মবিশ্বাসী পশ্চিম ইয়োরোপের জীবনবাদও একাংশে স্বীকার করেছিলেন বঙ্কিম। অনুশীলন ধর্মের মধ্যে সমগ্রভাবে জীবনকে, জীবনের সমস্ত দিককে, সত্য বলে স্বীকার করার কথা আছে (পৃঃ ৩২)। অন্তত মনুষ্যপ্রকৃতির কোনও দিককে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা কর্তব্য নয়, এই ঘোষণার দ্বারা বইটি সচেতন যুবকদের কাছে অনেক গ্রহণীয় হয়েছিল। অবশ্য অনুশীলনের ব্যাখ্যার গুণে এই স্বীকৃতিও অতিকষ্টকৃত অর্দ্ধস্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি হয়ে দাঁড়ায়, তবু তত্ত্বের বিবৃতিতে এই স্বীকৃতিই গ্রন্থের বক্তব্যকে প্রচলিত ধর্মব্যাখ্যা থেকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছিল। এবং এই বক্তব্যের সমর্থনে সন্ন্যাস ধর্মকে অসম্পূর্ণ ধর্ম বলে উল্লেখ করায় জীবনবাদের জয় স্বীকৃত হয়েছিল (পৃঃ ২৫)। যুবকদের কাছে বইটি বিশেষত আদৃত হয়েছিল এই কারণে যে, ধর্মীয় বা নৈতিক উন্নতির সঙ্গে বাস্তব জীবনের দায়িত্ব জড়িত, এই কথা বলে ধর্ম হিসেবে, শরীর চর্চা, অস্ত্রশিক্ষা ইত্যাদির ঐকান্তিক প্রয়োজনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং অত্যন্ত বুদ্ধিযুক্ত সংযমের সঙ্গে অস্ত্র আইনকে 'ভুল' বলা হয়েছিল। (দ্রষ্টব্য: ৮ম অধ্যায়, শারীরিকী বৃত্তি, পৃঃ ৩৮-৪৭)। সর্বোপরি, স্বদেশ রক্ষাকে বিশেষত ধর্ম বলে গুরুত্ব দিয়েছিলেন বঙ্কিম। হিন্দু চিন্তার কাঠামোর মধ্যে এই নতুন দায়িত্ব-ভাবনা বা আদর্শের সংযোগ-ই গ্রন্থের

বক্তব্যকে শিক্ষিত, জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ এবং শ্রেষ্ঠত্বাভিমানে স্ফীত উচ্চবর্ণের হিন্দুযুবকদের কাছে এত প্রিয়, এত মূল্যবান করে তুলেছিল।

২

ধর্ম্মতত্ত্ব গ্রন্থের পশ্চাদপট বিবেচনা করা গেল। বর্তমানে গ্রন্থের মূল বক্তব্যের বিস্তৃততর বিচার প্রয়োজন। ধর্ম্মতত্ত্বের উপসংহারে (পৃঃ ১৪০-৪১) তিনি গ্রন্থের সারাংশ বিবৃত করেছেন—কিন্তু তাঁর মূল মতের আরো স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে আরো চারবৎসর পরে ১৮৯১-তে, কৃষ্ণচরিত্রের দ্বিতীয় সংস্করণের উপক্রমণিকা বা ভূমিকায়। যথা:

"—ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্মতত্ত্ব নামে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতে আমি যে কয়টি কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি সংক্ষেপে তাহা এই:—

১। মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে, আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।

২। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম।

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।

৪। তাহাই সুখ।

এক্ষণে আমি স্বীকার করি যে, সমস্ত বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ অনুশীলন, প্রস্ফুরণ, চরিতার্থতা ও সামঞ্জস্য একাধারে দুর্লভ।..."

উপরোক্ত বিবৃতিতে ধর্মীয় ধারণাগুলিকে বাদ দিয়ে বঙ্কিম তাঁর মত কি, তা প্রকাশ করেছেন। সেটাই সঙ্গত মনে হয়, কারণ তাঁর মতের কাঠামোটি ধর্ম্মশাস্ত্র থেকে পাওয়া নয়, পশ্চিমী দার্শনিকদের রচনা থেকে সংগৃহীত। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস, জাতীয় অভিমান ও তৎকালীন সমাজ-কাঠামো রক্ষার আগ্রহ, একাকার হয়ে তাঁকে পশ্চিমী দার্শনিক মতগুলির সঙ্গে তাঁর নিজের ধারণানুযায়ী হিন্দুধর্মের বোধ-বিশ্বাসগুলির সামঞ্জস্য স্থাপন করতে প্রণোদিত করেছিল।

নিম্নলিখিত ধারায় তিনি এই সেতুবন্ধ রচনা করেছিলেন।

"গুরু।...তুমি কাল বলিয়াছিলে যে, বিলাতী অনুশীলনের উদ্দেশ্য

সুখ, ভারতবর্ষীয় অনুশীলনের উদ্দেশ্য মুক্তি। আমি তদুত্তরে বলি, মুক্তি সুখের অবস্থা বিশেষ। সুখের পূর্ণমাত্রা এবং চরমোৎকর্ষ।" (দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ সুখ কি?, পৃঃ ৭)।

"মোক্ষ আর কিছুই নয়, ঐশ্বরিক এবং আদর্শ-নীত ঈশ্বরানুকৃত স্বভাব প্রাপ্তি। তাহা পাইলেই সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া গেল এবং **সকল সুখের অধিকারী হওয়া গেল।**" (বড় অক্ষর আমার। দ্রষ্টব্যঃ চতুর্থ অধ্যায়ঃ মনুষ্যত্ব কি?, পৃঃ ১৮) এবং আরো "যে মুক্ত,...তাহার মনের সুখের সীমা নাই, যে মুক্ত, সে-ই ইহজীবনেই সুখী।...সুখের উপায় ধর্ম্ম।" (উনবিংশ-তম অধ্যায়ঃ ভক্তি, পৃঃ ৮৮)

হিন্দুর মুক্তি বা মোক্ষবাদের সঙ্গে এইভাবে *utilitarianism*-এর সংযোগ স্থাপিত হল। অতঃপর প্রশ্ন ওঠে যে, এই সর্বাধিক সুখ প্রাপ্তির উপায় কি? এইখানেই তাঁর অনুশীলন ধর্ম ব্যাখ্যাত হয়েছে।

পূর্ব্বোক্ত উদ্ধৃতির থেকেই এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য পাওয়া যাবে। মানুষের শক্তি বা বৃত্তিগুলির অনুশীলন এবং সেই অনুশীলনের মধ্যে সামঞ্জস্যই সুখ। কোনও বিশেষ বৃত্তির অপরিমিত বা সামঞ্জস্যহীন অনুশীলনই দুঃখের কারণ। এক্ষেত্রে তাঁর মতের সমস্ত কাঠামো নির্ভর করছে সমস্ত শক্তি বা বৃত্তির অনুশীলনের সামঞ্জস্যের ওপর বা সামঞ্জস্যের সম্ভবপরতার ওপর। কারণ তাঁর মতে, "আমাদের সমুদায় বৃত্তিগুলির স্ফূর্তি, সামঞ্জস্য এবং উপযুক্ত পরিতৃপ্তিই সুখ।" (সপ্তম অধ্যায়ঃ সামঞ্জস্য ও সুখ, পৃঃ ২৮)। অথবা আরো স্পষ্টত, "অনুশীলন নীতির স্থূল গ্রন্থি এই যে, সর্ব্বপ্রকার বৃত্তি পরস্পর পরস্পারের সহিত সামঞ্জস্য বিশিষ্ট হইয়া অনুশীলিত হইবে, কেহ কাহাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া অসঙ্গত বৃদ্ধি পাইবে না।" (নবম অধ্যায়ঃ জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি, পৃঃ ৪৯)। কিন্তু বিবৃতিতে যা স্পষ্ট ও সদর্থক, অনুশীলন ধর্মের ব্যাখ্যায় তা বহু শর্ত ও নিষেধ-কণ্টকিত। এই সব শর্ত ও নিষেধমূলক অনুশীলন, তাঁর জীবনবাদকে বহুলাংশে খণ্ডিত করেছে। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলি থেকে তাঁর কুণ্ঠা এবং শেষপর্যন্ত পরস্পর-বিরোধিতা স্পষ্ট হবে।

"শিষ্য। তবে বুঝিলাম যে এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে—যথা কামাদি, যাহার দমন-ই সমুচিত স্ফূর্ত্তি।

গুরু। দমন অর্থে যদি ধ্বংস বুঝ তবে একথা ঠিক নহে। কামের ধ্বংসে মনুষ্য জাতির ধ্বংস ঘটিবে। সুতরাং এই কদর্য্য বৃত্তিরও ধ্বংস ধর্ম্ম নহে—অধর্ম্ম।..."(ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ সামঞ্জস্য ও সুখ, পৃঃ ২৩)

জীবনকে, প্রাণীনতাকে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে এই প্রবল কুণ্ঠা স্বভাবত-ই তাঁকে শেষ পর্যন্ত স্ব-বিরোধিতার পথে নিয়ে গেছে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে (তাঁর পরিভাষায় অধ্যায়) তিনি বলছেনঃ "স্বতঃস্ফূর্ত্ত পাশব বৃত্তির অনুশীলনের উপাদান ও মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের উপাদান পরস্পর বড় বিরোধী। যেখানে ওগুলি থাকে সেখানে এগুলি থাকিতে পারে না।...এ সকলের দমন-ই যথার্থ অনুশীলন।" (বড় অক্ষর আমার)

সামঞ্জস্যবিহিত অনুশীলন শেষ পর্যন্ত তাঁর-ই ব্যাখ্যায় অসম্ভব হল কারণ বিভিন্ন বৃত্তি পরস্পরবিরোধী। 'যেখানে ওগুলি থাকে সেখানে এগুলি থাকে না'। ফলে, অন্যান্য সমস্ত অধ্যাত্মবাদীর মতো-ই প্রাণীনতাকে প্রথমে ঘৃণা এবং শেষ পর্যন্ত অস্বীকার করতে হয়েছে তাঁকে। কারন প্রথমত, বৃত্তিগুলি যদি পরস্পরবিরোধী হয় তাহলে তাদের সামঞ্জস্য অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, যেখানে দমন-ই অনুশীলন সেখানে উচ্ছেদের সঙ্গে তার গুণগত পার্থক্য কার্যত অনুপস্থিত। বিশেষত, তিনি নিজেই শারীরিক বৃত্তির পরিণতির প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা যদি স্মরণ করা যায়ঃ "তুমি যে স্বাভাবিক পরিণতির কথা বলিতেছ, তাহার দুইটি কারণ। সেই দুইটি কারণ—পোষণ ও পরিচালনা। তুমি কোন একটি শিশুর বাহু কাঁধের কাছে, দৃঢ় বন্ধনীর দ্বারা বাঁধিয়া রাখ, বাহুতে আর রক্ত না যাইতে পারে, তাহা হইলে ঐ বাহু আর বাড়িবে না। হয়ত অবশ নয় দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে।...

আবার বাঁধিয়া কাজ নাই। এমন বন্দোবস্ত কর যে, শিশু কখনও আর হাত নাড়িতে না পারে। তাহা হইলে ঐ হাত অবশ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে, অন্ততঃ হস্ত সঞ্চালনে যে ক্ষিপ্রকারিতা জৈবকার্য্যে

প্রয়োজনীয়, তাহা কখনও হইবে না।”…(চতুর্থ অধ্যায়ঃ মনুষ্যত্ব কি ? পৃঃ ১৫)। এই কারণেই মেনে নিতে হবে যে কোন বৃত্তির দমনের স্বাভাবিক পরিণাম উচ্ছেদ। এই জন্যে, রামকৃষ্ণ প্রমুখ যে সব ধর্ম-সাধক স্পষ্টত নিবৃত্তিমার্গের কথা বলেছেন, তাঁদের মত গ্রাহ্য হোক, অগ্রাহ্য হোক, শর্তকন্টকিত অর্দ্ধ-স্বীকারের চেয়ে যুক্তিসিদ্ধ নিশ্চয়ই। বস্তুত বঙ্কিম স্বয়ং অনুশীলনের প্রয়োজনকে এই ভাবে খণ্ডিত করেছেন ঃ “যে বৃত্তি অনুশীলন সাপেক্ষ নহে, অর্থাৎ স্বতঃ স্ফূর্ত, তাহার অনুশীলন জন্য সময় দিব না” (৭ম অধ্যায়, পৃঃ ২৭)। যদি কোন বৃত্তি আদৌ অনুশীলন-সাপেক্ষ না হয়, তাহলে অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা খণ্ডিত হয়। যদি কোন বৃত্তির অনুশীলনের জন্যে সময় না দেওয়া-ই বিধি হয়, তাহলে সেই বৃত্তির আদৌ অনুশীলন ঘটেনা। সেক্ষেত্রে সকল বৃত্তির অনুশীলন বা সামঞ্জস্য ও ঘটে না। এই অবস্থায় ‘দমন-ই অনুশীলন’ বলে বিপদ এড়াবার চেষ্টা কখনই সফল হতে পারে না। কারণ ক্যাটেগোরির বিচারে দমন দমন, এবং অনুশীলন অনুশীলন। দমন যদি অনুশীলন হয়, তবে অনুশীলন নিছক একটি শূন্য শব্দ মাত্রে পর্যবসিত হয়। দ্বিতীয়ত, আমরা পূর্বেই যা দেখেছি, দমনের স্বাভাবিক পরিণাম উচ্ছেদ বা এমন অকর্মণ্যতা, যার কার্যকরী চরিত্র, উচ্ছেদের থেকে স্বতন্ত্র নয়।

বস্তুত, বিভিন্ন বৃত্তি সম্বন্ধে এই বিবিধ পরস্পরবিরোধী উক্তির মূলে রয়েছে এই নিম্নোক্ত দ্বন্দ্ব। বিভিন্ন প্রবৃত্তি সম্বন্ধে প্রথাসূত্রে পাওয়া ধর্মীয় সংস্কার বা মূল্যবোধগুলি তিনি আরোপ করেছেন বৈজ্ঞানিক সর্বাস্তিবাদী মানবিক ক্ষমতার বা Faculties-এর ধারণার ওপর। ধর্মীয় সংস্কার বা বোধ কতকগুলি প্রবৃত্তিকে স্পষ্টত খারাপ বলে ধিক্কার দেয় এবং মানুষকে তা অস্বীকার করতে বলে। কোন কোন ব্যক্তি সেই পথে চলেন, অধিকাংশই চলেন না। কেউ কেউ সে পথে গিয়ে ফিরে আসেন। অন্যপক্ষে মানবিক ক্ষমতা, এবং সেগুলির সুসম্বদ্ধ বিস্তার ও বিস্তার-সম্ভাবনা নির্ভর করছে নিউটনের পদার্থবিজ্ঞানের পদ্ধতিকে মানব-মনের ওপর প্রয়োগ-সাফল্যে। নিউটনের আবিষ্কার গুণে একটি সুশৃঙ্খল বিশ্বব্যবস্থার ধারণা জন্ম নেয়। এই বিশ্বজগত কতকগুলি

সুপ্রতিষ্ঠিত অব্যয় নিয়মের অধীন। একটি সুসংবদ্ধ যন্ত্রের মতো এর প্রতিটি অংশ অন্য অংশের সঙ্গে সুসঙ্গতভাবে সংযুক্ত। প্রত্যেক অংশ একে অন্যের পরিপূরক ও সমগ্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যগুণে অবিরোধী। এই সুসংবদ্ধ, পারস্পরিক সঙ্গতি-সম্পন্ন বিশ্ববোধ যদি মানবপ্রকৃতির ওপর আরোপ করা যায়, তাহলে যে মতের উদ্ভব হয়, তা বঙ্কিমের ভাষাতে, "জগত্তত্ত্ব যতই আলোচনা করা যাইবে ততই বুঝিব যে, আমাদের মঙ্গলের সঙ্গেই জগৎ সম্বন্ধ। নিখিল বিশ্বের সর্ব্বাংশই আমাদের সকল বৃত্তিগুলিরই অনুকূল। প্রকৃতি আমাদের সকল বৃত্তি গুলির-ই সহায়।" (ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ২৬)

এই মতের বিস্তৃততর বিচারে অবতীর্ণ হবার পূর্বে একটি বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এখানে বৃত্তিগুলির ওপর কোনো মূল্য বিচার (Value Judgement) করা হয়নি। প্রকৃতির সাক্ষ্য অনুযায়ী সকল বৃত্তিরেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গী বিজ্ঞানের, যদিও মানবমন সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত বা অনুমানের ওপর এর ভিত্তি, তা বিজ্ঞানসম্পর্কহীন। বিভিন্ন বৃত্তি সম্বন্ধে নৈতিক মূল্যায়ন করলেই আমরা অন্য জগতে গিয়ে দাঁড়াই। প্রথমত, প্রকৃতির অতীত বা বহির্ভূত কোন সত্তার নিরিখে বৃত্তিগুলির বিচার করতে হয়। দ্বিতীয়ত, মূল্যায়ন করলেই আর সকল বৃত্তির সমান আনুকূল্য কাঙ্ক্ষিত থাকে না। এই মূল্যায়নের ফলে. তত্ত্বের খাতিরে সমস্ত বৃত্তির অনুশীলনকে মেনে নেবার সংগে সংগে বঙ্কিমকে আবার স্ব-বিরোধিতার আশ্রয় নিয়ে বলতে হয়েছে যে, বিভিন্ন বৃত্তি পরস্পরবিরোধী এবং কোন কোন বৃত্তির অনুশীলন অনুচিত।

মতবাদ হিসেবে 'জগত্তত্ত্ব' সম্পর্কে এই বিশেষ মত অক্ষয় দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) তাঁর 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'এ (১ম ও ২য় ভাগ ১৮৫১ ও ১৮৫৩) উপস্থাপিত করেন। পরিণত জীবনে যে তিনি এই মত অতিক্রম করেন, তার প্রমাণ আছে। অক্ষয় দত্তের প্রায় তিনদশক পরে লেখনী ধারণ করলেও বঙ্কিম এই মতের সীমা লঙ্ঘন করতে পারেন নি। বরং তাঁর মতের মধ্যে যেটুকু দার্শনিক

গুরুত্বসম্পন্ন, তা এই বিবৃতির মধ্যে নিহিত। সুতরাং এই মতবাদের বিচার প্রয়োজন।

এই মতবাদ স্বীকার্য বা valid নয় এই কারণে যে, এর ভিত্তি প্রমাণসাপেক্ষ নয় অনুমানসাপেক্ষ। জগত্তত্ত্ব আমাদের কি উদ্দেশ্যে কি হয় তা বলে না, বলতে পারে না। কি কারণে কি হয়, বিজ্ঞানী তা বলতে পারেন, কি উদ্দেশ্যে কি হয়, তা বলার কথা তাঁর নয়। জলীয় বাষ্পবাহী বায়ু ঊর্ধ্বাকাশে শীতল হয়ে জলকণা গঠন করলে, তা বৃষ্টি রূপে পৃথিবীতে নেমে আসে। ঘটনার অনুসরণ করে বিজ্ঞানী তা বলতে পারেন কিন্তু বৃষ্টি কি উদ্দেশ্যে পড়ে, তা তিনি জানতে বা বলতে পারেন না। বৃষ্টিপাতের ফলে শস্যোৎপাদন ও জলপ্লাবন ইত্যাদি বহু কিছু ঘটতে পারে। এ-সব কিছুই বৃষ্টিপাতের উদ্দেশ্য কি না, তার প্রমাণ নেই ; এ-সবই বৃষ্টিপাতের ফল বা পরিণাম মাত্র, তা বলা যায়। উদ্দেশ্য-বিচার কার্য-কারণ-সম্পর্কের ক্ষেত্রভুক্ত নয়। আবার বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে, বানরের ও মানুষের হাত কি কি কাজ করেছে, তা বিজ্ঞানী বলতে পারেন ; কিন্তু দেশ-কাল নিরপেক্ষ ভাবে হাতের উদ্দেশ্য কি, এ প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞানীর দেয় নয়। বিজ্ঞানের জগত কার্যাবলী বা function নিয়ে ; লক্ষ, উদ্দেশ্য বা purpose নিয়ে নয়।

উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে আগে সমগ্রকে জেনে, সমগ্রের লক্ষ নির্ণয় করে, তার পরিপ্রেক্ষিতে খণ্ড খণ্ড ঘটনার তাৎপর্যকে ব্যাখ্যা করতে হয়। দেশকালব্যাপী বিমূর্ত সমগ্রের প্রকৃতি কি, এ-বিষয়ে সকলেই স্বেচ্ছামত অনুমান করতে পারে, কেউ-ই কোন প্রমাণ দিতে পারে না। আগে সমগ্রের লক্ষ স্থির করে তারপর খণ্ডকে জানার চেষ্টা করলে অশ্বের পূর্বে রথের যোজনা ঘটে। এই কারণেই জগত্তত্ত্ব আলোচনা করে যদি আমরা প্রকৃতির সঙ্গে মানবের মঙ্গল সম্বন্ধ আবিষ্কার করি, তবে আমরা প্রকৃতির ওপর মানবিক গুণ ও উদ্দেশ্য আরোপ করব শুধু। সংক্ষেপে, প্রকৃতির প্রকৃতি সম্বন্ধে ভিত্তিহীন, অপরীক্ষিত এবং পরীক্ষার অযোগ্য অনুমানের আশ্রয় নেব। ৬৩

৬৩। ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে এই মতবাদের আলোচনার জন্যে আরো

এ পর্যন্ত দেখা গেল যে, বিভিন্ন বৃত্তির পারস্পরিক সম্বন্ধ বা সামগ্রিক কাঠামো সম্বন্ধে বঙ্কিমের দৃষ্টিতে স্ব-বিরোধিতা ছিল, ফলে তাদের অনুশীলন সম্বন্ধে তাঁর বিবিধ নির্দেশের মধ্যে গুরুতর স্ব-বিরোধিতা না এসে পারে নি। প্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির মধ্যে যে সম্বন্ধ তিনি জগতত্ত্বের অনুকূল বলে মনে করেছেন, তাও প্রকৃতির ওপর মানবত্ব আরোপ না করে পারা যায় না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও স্বচ্ছন্দে দাবী করা যায় যে, বঙ্কিমের মূল বক্তব্য স্পর্শ করা যায় নি। বলা যেতে পারে যে, তিনি বৃত্তি ও অনুশীলনের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাতে আপেক্ষিক ভ্রান্তি থাকলেও তাঁর যে মূল প্রতিপাদ্য, অর্থাৎ সকল বৃত্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশেই সর্বাধিক সুখ, তা খণ্ডিত হয় নি। এবং এও বলা যায় যে, বঙ্কিম পুনঃপুনঃ জানিয়েছেন যে, তাঁর ব্যাখ্যা-ই শেষ কথা নয়—শুধু তাঁর তত্ত্ব-ই সত্য। এক্ষেত্রে বঙ্কিমের মতের চূড়ান্ত বিচারের জন্যে সামঞ্জস্যের ধারণা কতদূর গ্রাহ্য তারই বিচার প্রয়োজন। কারণ সেই ধারণাই তাঁর ধর্ম্মতত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি সেটিকে দুরূহ বলেছেন কিন্তু কোথাও স্ব-বিরোধী এবং আদৌ অসম্ভব বলেন নি।

ধর্ম্মতত্ত্বে সবত্র-ই বলা হয়েছে যে, কোন বৃত্তির অপরিমিত অনুশীলন-ই দুঃখের কারণ। সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলন-ই সুখের ভিত্তি। অথচ একটি ঘটনা বা কাজের সামগ্রিক ফল পূর্বাহ্নে স্থিরনির্ণয় করা যায় না। কারণ তা আমাদের অগোচর, দেশে-কালে ও সমাজে পরিব্যাপ্ত পরিণাম। সময়ের কোনও এক বিন্দুতে একটি কাজ অনুষ্ঠিত হবার আগে, এমন কি সেই সময়েও, তার সমস্ত ফলাফল মানুষের জ্ঞানে অথবা বুদ্ধিতে নির্ণেয় নয়। কারণ. তাহলে, প্রথমত, সমগ্রকে আগে সমগ্রভাবে জানতে হবে। অথচ তা অসম্ভব, কারণ তা হলে দ্রষ্টার পক্ষে সমগ্রের বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। তা কার্যত অসম্ভব এবং

ধারণাতেও স্ব-বিরোধী, কারণ সমগ্রের বাইরে যদি কিছু থাকে, তাহলে সমগ্র আর সমগ্র থাকে না।

দ্বিতীয়ত, সমগ্রের প্রত্যেক খণ্ড অংশকে এবং সেই সব বিভিন্ন খণ্ডের পারস্পরিক সম্বন্ধ কি, তা জানতে হবে। তৃতীয়ত, সমগ্রের সঙ্গে সেইসব খণ্ডের কি বা কত সংখ্যক সম্পর্ক, তা নির্দিষ্ট রূপে জানতে হবে।

এই কারণে বিশেষ কোন বৃত্তির কতটা অনুশীলন কার্যত অতি অনুশীলন হয়ে দাঁড়ায় বা দাঁড়াতে পারে, তা অনুশীলনের আগে বা অনুশীলনের সময়েও বোঝা যায় না। ফলাফল বোঝা যায় ক্রিয়ানুষ্ঠানের পরে। তাও সমগ্র ফলাফল নয়, কারণ তা দেশ ও কালের ধারায় বাহিত হয়। যে কোন ক্ষেত্রে, যে কোন সময়ে, আংশিক ফল-ই মানুষের চোখে পড়ে।

এই সামঞ্জস্যের ধারণা সম্ভবত পদার্থবিজ্ঞানের (এবং সেই উৎস থেকে economist-দের দ্বারা ধার করা) equilibrium-এর মতোই একটি কল্পনা। অথচ এটি পদার্থবিজ্ঞানের equilibrium-এর মতো এমন একটা অবস্থা নয় যে, বিশ্বব্যবস্থা আপন স্বাভাবিক প্রেরণায় যার অভিমুখী। এই সামঞ্জস্য একটি আদর্শ হিসেবে প্রতিভাত, অথচ ধারণা হিসেবে বিচার করলে এর কোন রূপ বা গঠন চোখে পড়ে না। ফলে এই ধারণার নিরখে কোন কাজের বিচার চলে না। সৃষ্টি হয় চক্রবৎ যুক্তি বিন্যাসের (circular logic) যার ধারা নিম্নরূপ।

১। কোন কাজ করার আগে দেখা উচিত যে তাতে সমগ্রের সামঞ্জস্য বিঘ্নিত হচ্ছে কি না।

২। কোন কাজ করার আগে (বা সেই সময়েও) জানা যায় না যে, তার সম্পূর্ণ ফলাফল কি হবে। (কারণ আমরা সমগ্রের অংশ। সমগ্র আমাদের ধারণায়ত্ত নয়)। সেই কারণে, কোন কাজের ফলে সমগ্রের সামঞ্জস্য বিঘ্নিত হচ্ছে কি না, তা অনুষ্ঠানের আগে, সেই সময়ে, এমনকি পরেও সম্পূর্ণ জানা যায় না।

বঙ্কিম নিজেও অবস্থার গুরুত্ব সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন না। তুলনীয় ঃ

"গুরু। সমবায়ই সুখ। ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও পরিতৃপ্তি সুখের অংশমাত্র।

শিষ্য। তবে কষ্টিপাতর কোনটা? সমবায় না অংশ?

গুরু। সমবায়ই কষ্টিপাতর।

শিষ্য। এত বুঝিতে পারিতেছি না। মনে করুণ আমি ছবি আঁকিতে পারি। কতকগুলি বৃত্তিবিশেষের পরিমার্জ্জনে এ শক্তি জন্মে। কথাটা এই যে, সেই বৃত্তিগুলির সমধিক সম্প্রসারণ আমার কর্ত্তব্য কি না, আপনাকে এ প্রশ্ন করিলে আপনি বলিবেন, 'সকল বৃত্তির উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি ও চরিতার্থতার সমবায় যে সুখ, তাহার কোন বিঘ্ন হইবে কি না, এ কথা বুঝিয়া তবে চিত্রবিদ্যার অনুশীলন কর।" অর্থাৎ আমার তুলি ধরিবার আগে গণনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, ইহাতে আমার মাংসপেশীর বল, শিরা ধমনীর স্বাস্থ্য, চক্ষের দৃষ্টি, শ্রবণের শ্রুতি—আমার ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি, দীনে দয়া, সত্যে অনুরাগ—আমার অপত্যে স্নেহ, শত্রুতে ক্রোধ—আমার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, দার্শনিক ধৃতি—আমার কাব্যের কল্পনা, সাহিত্যের সমালোচনা—কোন দিকে কিছুর বিঘ্ন হয় কি না। ইহাও কি সাধ্য?

গুরু। কঠিন বটে নিশ্চয় জানিও।···ধর্ম্মাচরণ অতি দুরূহ ব্যাপার।···দুরূহ কিন্তু অসাধ্য নহে।" (সপ্তম অধ্যায়: সামঞ্জস্য ও সুখ, পৃঃ ২৮-২৯)

অথচ দার্শনিক বিচারে প্রতিপন্ন এই যে, এটি অসাধ্য। অবাস্তব কল্পনা। এই ভিত্তিতে চিত্রাঙ্কন করতে গেলে জগতের চিত্রশালাগুলি শূন্য থাকে ও থাকত। এক্ষেত্রে সামঞ্জস্যের বিধি অর্থহীন। অথচ এই অর্থহীন বিধির যিনি প্রণেতা, তাঁর পলায়নপথ, স্বীয় যুক্তিগুণে সর্বদাই উন্মুক্ত থাকে। যে কোন বৃত্তির অনুশীলনে যদি কোথাও কিছুমাত্র দুঃখের কারণ ঘটে, তাহলে-ই তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব যে, এক্ষেত্রে বিশেষ বৃত্তির অপরিমিত অনুশীলন ঘটেছে বলেই দুঃখের উদ্ভব ঘটেছে। অথচ দেখা গেল যে, পরিমিত অনুশীলন বলতে ঠিক কতটা অনুশীলন বোঝায়, তার পরিমাণ বা রূপ নির্ণেয় নয়। এক্ষেত্রে উপদেষ্টা

এমন উপদেশ দেন যা ধারণায় অসম্ভব, এবং প্রয়োগে অর্থহীন। অথচ তার অসম্ভাবিতার দায়িত্ব তিনি বহন করেন না। সেই কারণে এটি অনৈতিকও বটে।

সামঞ্জস্যের ধারণার দ্বিতীয় প্রধান অসঙ্গতি এই যে, পৃথিবীতে কোন স্থির, অবিচলিত বা অনড় সামঞ্জস্য সম্ভব নয়। কারণ বাস্তবে প্রত্যেকটি বস্তু বা সত্তা সর্বদা চঞ্চল। সংকোচন বা সম্প্রসারণশীল। ফলে তাদের অন্তর্সম্বন্ধ সর্বদা অস্থির, অনির্দিষ্ট। এক একটি প্রয়োজন এক এক সময়ে আত্যন্তিক বা অনুপস্থিত। এই অবস্থায় সব কিছুর সমবায়ে স্থির সামঞ্জস্য আদৌ অসম্ভব। সামঞ্জস্য যদি কিছু থাকেও, তবে তাও সময় তথা বস্তুপুঞ্জের বিন্যাসের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা পরিবর্তনশীল। এক্ষেত্রে সমগ্র দূরে থাক্, 'অন্যান্য সমস্ত অবস্থা অপরিবর্তিত আছে, এই অনুমানের আশ্রয় না নিলে কোন বিষয়ে বা বস্তুর বিষয়ে কিছু জানা যায় না। আর যেহেতু প্রত্যেক বিষয়ে আমাদের জ্ঞান মূলত এই অনুমানের আশ্রয়ে সংগৃহীত, সেই হেতু, যে কোন বস্তুর সামগ্রিক প্রকৃতি এবং সে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কিছুটা ভিন্ন না হয়ে পারে না। কারণ যে কোন জিনিস বা সত্তার-ই সামগ্রিক প্রকৃতি অন্যান্য সমস্ত সত্তার সঙ্গে নিত্য পরিবর্তনশীল অজস্র সম্বন্ধ-সূত্রে সর্বদা পরিবর্তনশীল। জলের প্রকৃতি তার তাপ, চাপ, জীবাণুর উপস্থিতি ও আধারের গঠনের কথা, তার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের কথা, ইত্যাদি বাদ দিয়ে ভাবা যায় না; এবং এইভাবে পারিপার্শ্বিকের প্রকৃতি যত পরিবর্তিত হবে, বস্তুর প্রকৃতিও ততই ভিন্ন হবে। অন্যপক্ষে, যে কোন বস্তুর সম্বন্ধেই আমাদের জ্ঞান অবিচল পারিপার্শ্বিকের স্থিতি দাবী করে। এর ফলে, যে কোন বিষয়ে আমাদের জ্ঞান আপেক্ষিক; বিশেষ কাল ও অবস্থার পক্ষে সত্য, এবং সত্য operationally valid বা কাজ চলা সত্য, এই হিসেবে। কোন বিষয়ে সমস্ত পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধমুক্ত বিশুদ্ধ জ্ঞান—(Der-Ding-in-sich) আমাদের জ্ঞেয় নয়। আর তাই সর্ববিষয়ে আমাদের জ্ঞান যখন আপেক্ষিক ও অসম্পূর্ণ, তখন সর্ববিষয়ের সামঞ্জস্যের দাবী করা অসঙ্গত

না হয়ে পারে না। আর সেই অসম্ভব সামঞ্জস্যকে ভিত্তি করে মানুষের পক্ষে কোন কাজে হাত দেওয়াই অসম্ভব হয়। তাই চিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্বে শিষ্য যে প্রশ্ন তুলেছেন, তাতে গুরুর দাবী মেনে অগ্রসর হতে গেলে, জগতের সমস্ত চিত্রশালাই শূন্য থাকে। তাছাড়া ধরা যাক্ সামঞ্জস্যের একটি ধারণা মনে রেখে কেউ কোন একটি বৃত্তির অনুশীলন করে গেলেন। কিন্তু সেই কাজ শেষ হবার আগেই সামঞ্জস্যের কাঠামো বদলে যেতে পারে। ফলে শত চেষ্টা সত্ত্বে ঈপ্সিত ফল অনায়ত্ত থেকে যাবে। বিপরীত, অন্তত স্বতন্ত্র ফল উদ্ভূত হবে।

ফলত সত্য এই যে, বাস্তবে কোন সামঞ্জস্য নেই। যদি থাকে, তবে তা অতীত হবার আগে তাকে কোন ভাবে জানা যায় না। এবং সেই জানাও মানুষের জ্ঞানে সম্পূর্ণ হয় না। ফলে, মানুষ আগে সমগ্রকে জেনে, পরে বিশেষ ক্ষেত্রে কর্তব্য নির্দ্ধারণ করে চলতে পারে না। এক একটি অবস্থায় এক একটি কর্তব্য মানুষের কাছে অগ্রাধিকার পায়। আর আপন প্রবণতা ও পরিবেশের ঘাত প্রতিঘাতে, এক এক জন মানুষের কাছে, এক একটি বা কিছু সংখ্যক কর্তব্য প্রধান হয়ে ওঠে। তারই সম্পাদনে যথাশক্তি আত্মনিয়োগ করে-ই ব্যক্তি-মানুষ আপন ব্যক্তিত্ব তথা মনুষ্যত্বকে বিকশিত করে বা করতে পারে। কোন কাল্পনিক বা নৈর্ব্যক্তিক সামঞ্জস্যের পশ্চাদ্ধাবন করে কেউ স্বীয় কর্তব্য আবিষ্কার করে না। করতে পারে না। যে অস্থির, অপরিমিত (অনন্ত নয়) n-dimensional জগতের দেশ ও কালের একটি খণ্ড বিন্দুতে আমাদের স্থিতি, সেই আপেক্ষিক অবস্থানের দ্বারা-ই আমাদের বোধ ও কর্তব্য নিয়ন্ত্রিত ও নির্দিষ্ট হয়।

৩

উপরোক্ত বিশ্লেষণ যদি যথার্থ বলে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে বঙ্কিমের মূল প্রতিপাদ্য খণ্ডিত হয়েছে মেনে নিতে হবে। কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্ব স্মরণ রাখতে হবে, শুধু তত্ত্ব নয়, তা ধর্মও বটে। ধর্মীয় ধারণা-গুলিকে তত্ত্বের ক্ষেত্রে আরোপ করে মানুষের কর্তব্য নির্দেশ করাই তাঁর

ঘোষিত উদ্দেশ্য। বিবিধ বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের বিবিধ নির্দেশ ও আদর্শের সামঞ্জস্য বিধান করে, হিন্দু বিধিগুলির নিত্যতা ও উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করাই তাঁর স্ব-নির্বাচিত লক্ষ। এই লক্ষসিদ্ধির পথে তিনি কি ভাবে অগ্রসর হয়েছেন ও কতটা সিদ্ধকাম হয়েছেন, তার পর্য্যালোচনা প্রয়োজন। নতুবা বিচার অসম্পূর্ণ থাকে।

পূর্বেই দেখা গেছে যে, তাঁর মতে, "মুক্তি সুখের অবস্থা বিশেষ। সুখের পূর্ণমাত্রা এবং চরমোৎকর্ষ।" এই মত হিন্দু ঐতিহ্য সম্মত নয়। কারণ হিন্দু মতে, মুক্তির কোন বাচনিক বিবরণ সম্ভব নয়। ব্রহ্মস্বরূপ অনির্দিষ্ট এবং মুক্তি অনির্বচনীয়। সে চেষ্টার মূলেই ভুল। তা একমাত্র অপরোক্ষ স্বানুভূতির গোচর। দ্বিতীয়ত, হিন্দু ধারণার মূল কথা এই যে, সুখে বিগতস্পৃহ না হলে দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা হওয়া যায় না। মুক্তি বা মোক্ষ দুঃখের বিরোধী সর্বাধিক সুখ নয়। দুঃখ এবং সুখ উভয়ের-ই অতীত অবস্থা। সেই অবস্থার স্বরূপ কি, তা বাক্য বা মনের অগোচর। তা কেউ বলতে বা বর্ণনা করতে পারে না। কিন্তু ক্যাটেগেরির (category) বিচারে সেটি দুঃখের বিপরীত (contrary) অবস্থা নয়, অতীত (transcendental) স্তর।

হিন্দু ধর্মচিন্তার সঙ্গে এমন অনবহিত কেউ কেউ থাকতে পারেন, যাঁরা ঔপনিষদিক আনন্দকে সুখের সঙ্গে সমার্থক ভাবতে পারেন। তা হলে ভুল হবে। হিন্দু চিন্তায় মনও দেহময় এবং সুখ মানস। আনন্দ আত্মার। এবং এই আনন্দের স্বরূপ সুখের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বঙ্কিম নিজেও সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলেন না। (সপ্তবিংশতম অধ্যায়: চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি, বিশেষত পৃঃ ১৩২—১৩৬)

হিন্দুর মুক্তি ও হিতবাদী ধারণার এই প্রাথমিক সমীকরণ যে হিন্দুর চিন্তাসম্মত নয়, তা স্পষ্ট। এই চেষ্টার ফলে হিন্দু ধারণার মহিমাহানি ঘটেছে মনে হয়। বিভিন্ন বৃত্তির বিকাশের বা doctrine of culture-এর সঙ্গে হিন্দু জীবনাদর্শের যোগ স্থাপনেরও তিনি চেষ্টা করেন। প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন যে, হিন্দু ধর্মে যে জীবনচর্চার

নির্দেশ দেওয়া আছে, তা doctrine of culture-এর অনুরূপ। তাঁর এই চেষ্টা রূপ পায় ভক্তিবৃত্তির ব্যাখ্যায়। তাঁর মতে, "বৃত্তি সকলের সমুচিত স্ফূর্ত্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই; এবং সেই বৃত্তিগুলির ভক্তির অনুগামী না হইলেও মনুষ্যত্ব নাই। উভয়ের সমাবেশেই সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব। …(একাদশ অধ্যায় : ঈশ্বরে ভক্তি, পৃঃ ৬৩)

এ ক্ষেত্রে যে প্রশ্ন প্রথমে আসে তা এই যে, ভক্তিবৃত্তি ব্যতীত অন্যান্য বৃত্তির স্বতন্ত্র ও নিজস্ব কোন সার্থকতা আছে কি না; অন্তর্নিহিত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন নিজস্ব মূল্য আছে কি না। অন্তর্নিহিত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ মূল্যবান বৃত্তি, ভক্তি বৃত্তির অনুগামী না হলেও তার চর্চা করে মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্ব অর্জন করা সম্ভব হয় কি না। Doctrine of culture যাঁরা ব্যাখ্যা করেন, তাঁরা প্রত্যেক বৃত্তির নিজস্ব ও অন্তর্নিহিত মূল্য মেনে নিয়েছিলেন। সেই জন্যেই বিবিধ বৃত্তির পূর্ণ বিকাশের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা। ভক্তিবৃত্তির চূড়ান্ত শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিলে সেই মূল্যবোধ অস্বীকৃত হয়। উপরন্তু প্রশ্ন জাগে যে, ভক্তিবৃত্তির সঙ্গে অন্যান্য বৃত্তির বিরোধে কর্তব্য কি? বঙ্কিম এই মূল্যভেদের ও সম্ভাব্য দ্বন্দ্বের সম্ভাবনাকে এই ভাবে এড়িয়ে গিয়েছেন: "ভক্তির অনুবর্তিতা কোন বৃত্তির-ই চরম স্ফুর্ত্তির বিঘ্ন করে না"। (পৃঃ ৬২)। এটি একটি বিশ্বাসের ঘোষণা এবং মত হিসেবে সাম্প্রদায়িক মত। ঘটনার বিচারে দেখা যায় যে, ভক্তির অনুবর্তিতা বিচারশীলতার বিঘ্ন করে বা করতে পারে। অপরপক্ষে, প্রকৃতির অনুশীলন ভক্তিবৃত্তির বিঘ্ন করে। ডারুইনের জীবন তার প্রমাণ। প্রকৃতির অনুশীলনের ফলে নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঈশ্বরে বিশ্বাস তিনি হারিয়েছিলেন। মত হিসেবেও এটি সাম্প্রদায়িক মত, কারণ জ্ঞানবাদীরা মনে করেন নি, বা করেন না যে, ভক্তির অনুবৃত্তি জ্ঞানমার্গের বিরোধিতা করে না। তাঁদের মতে তা করে। বঙ্কিম নিজে জ্ঞানবাদের উপাসনাকে অসম্পূর্ণ মনে করেছেন। (দ্বাদশ অধ্যায়: ভক্তি, পৃঃ ৬৯) জ্ঞানবাদীরাও ভক্তিবৃত্তিকে অনুরূপ মনে করেছেন। কিন্তু বঙ্কিমের মত যদি সত্য বলে মেনেও নেওয়া হয়, তাহলেও দেখা যায় যে, তত্ত্বের বিবৃতিতে যা অবিরোধী (কারণ তা বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি) ব্যাখ্যা ও

প্রয়োগে তাই অজস্র অসঙ্গতি ও স্ব-বিরোধে পীড়িত। বস্তুত তা না হয়ে পারে না। কারণ প্রকল্প বা Hypotheses ভুল হলে তার প্রমাণে স্ব-বিরোধিতা থাকবেই।

কি ভাবে এই স্ব-বিরোধিতা রূপ নিয়েছে দেখা যাক। 'সামঞ্জস্য ও সুখ' শীর্ষক সপ্তম অধ্যায়ে (পৃঃ ৩৫) তিনি বলছেনঃ…"মনে কর দয়া বৃত্তির কথা হইতেছে, পরোপকারে ইহার অনুশীলন ও চরিতার্থতা।… ইহা যে অনুশীলিত করিয়াছে, সে জানে, দয়ার অনুশীলন ও চরিতার্থতায়, অর্থাৎ পরোপকারে এমন তীব্র সুখ আছে যে, নিকৃষ্ট শ্রেণীর ইন্দ্রিয়েকেরা সর্ব্বলোকসুন্দরীগণের সমাগমেও সেরূপ তীব্র সুখ অনুভূত করিতে পারে না। এ বৃত্তি যত অনুশীলিত করিবে ততই ইহার সুখজনতা বাড়িবে। নিকৃষ্ট বৃত্তির ন্যায় ইহাতে গ্লানি জন্মে না, অতিতৃপ্তিজনিত বিরাগ জন্মে না, বৃত্তির অসামর্থ্য বা দৌর্ব্বল্য জন্মে না, বল ও সামর্থ্য বরং বাড়িতে থাকে। ইহার নিয়ত অনুশীলন পক্ষে কোন ব্যাঘাত নাই।…"

দয়ার অনুশীলনে যে সুখ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন-ই তার প্রমাণ। হয়ত বঙ্কিমী মতে তিনি দয়াবৃত্তির অপরিমিত চর্চা করেছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তা বিবেচ্য নয়। উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে অন্তত এটুকু স্পষ্ট যে, দয়া বৃত্তি ও তার অনুশীলন অর্থাৎ পরোপকারের নিজস্ব ও অন্তর্নিহিত একটা সার্থকতা ও মূল্য আছে। পরোপকারের জন্যেই পরোপকার করা কর্তব্য।

কিন্তু ভক্তির অনুবর্তিতা যখন বিধান হল এবং সমস্ত "বৃত্তিগুলির ঈশ্বরমুখী" করা যখন ভক্তির স্বরূপ (একাদশ অধ্যায় ঃ ঈশ্বরে ভক্তি পৃঃ ৬১) বলে নির্দিষ্ট হল, তখন অন্যান্য বৃত্তিগুলির অবস্থা ও মূল্যায়ন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হল। যথা ঃ

"গুরু।…তুমি যদি দেশের দুঃখ নিজের দুঃখতুল্য বা তদধিক ভাবিয়া তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করিলে, তাহা হইলেও কর্ম্ম নিষ্কাম হইল না।… ঈশ্বরার্থ বা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট যে কর্ম্ম তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম্ম বন্ধন মাত্র (অনুষ্ঠেয় নহে) ; অতএব কেবল ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্মই করিবে।…সমস্ত বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী করিবে। (চতুর্দশ অধ্যায়ঃ ভক্তি, পৃঃ ৭৪)

এক্ষেত্রে সমস্ত বৃত্তিগুলির নিজস্ব কোন সার্থকতা, বা অন্তর্নিহিত মূল্য থাকে না। এর ফল দাঁড়ায় এই যে, দেশের মুক্তির জন্যে দেশের মুক্তির চেষ্টা করা অনুষ্ঠেয় নয়, অন্যের উপকারের জন্যে অন্যের উপকার করা অনুষ্ঠেয় নয়, বৈজ্ঞানিক সত্যনির্ণয়ের জন্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনুষ্ঠেয় নয়, সাহিত্যসৃষ্টির আনন্দে সাহিত্যরচনাও অনুষ্ঠেয় নয়। একমাত্র absolute বা সর্বেশ্বর ভক্তির প্রয়োজনে যতটুকু প্রয়োজন বিভিন্ন বৃত্তির ততটুকু অনুশীলনই বিধেয়। ভক্তির অনুবর্তিতা এনে, এইভাবে বঙ্কিম স্বয়ং স্বীয় মতের বিরোধিতা করেছেন। পূর্ববিবৃত উৎকৃষ্ট বৃত্তির সার্থকতা, শূন্য প্রতিপন্ন করেছেন। রামমোহনের ভাষায়, "স্বহস্তলগ্ন খড়্গে স্বীয় মুণ্ডচ্ছেদ" (পথ্যপ্রদান) করেছেন তিনি। এবং বলা বাহুল্য হলেও হয়তো বলা দরকার যে, এতে doctrine of culture, তার জীবনবাদ, মানবিক শক্তি সমূহের বিকাশের নিজস্ব সার্থকতা, পরিত্যক্ত হয়েছে।

সর্বক্ষেত্রে এই ভক্তিতত্ত্বের প্রয়োগ করতে গিয়ে, সর্বক্ষেত্রেই অসঙ্গতিজালে জড়িয়ে পড়েছেন তিনি। একটি সাধারণ বিষয়ের আলোচনাতেই তা পরিস্ফুট হবে। শারীরিকী বৃত্তির আলোচনায় (অষ্টম অধ্যায়, পৃঃ ৪৫) আহার সম্বন্ধে গীতার একটি শ্লোক (৮।১৭) উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন, "যে আহার আয়ুবৃদ্ধিকারক, উৎসাহবৃদ্ধি-কারক, বলবৃদ্ধিকারক, স্বাস্থ্যবৃদ্ধিকারক, সুখ বা চিত্তপ্রসাদ বৃদ্ধিকারক, এবং রুচিবৃদ্ধিকারক, যাহা রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, যাহার সারাংশ দেহে থাকিয়া যায় এবং **যাহা দেখিলে খাইতে ইচ্ছা করে**, তাহাই সাত্ত্বিকের প্রিয়।" (বড় অক্ষর আমার)। কিন্তু সমস্ত বৃত্তিকেই ভক্তির অনুবর্তী করে তোলার প্রয়োজন যখন সব কিছু ছাড়িয়ে গেল, তখন আহার সম্বন্ধে তাঁর মত,... "ভাত খাইতে হইবে সন্দেহ নাই 'প্রকৃতিজ গুণে' তোমাকে খাওয়াইবে কিন্তু **আহারে যেন অনুরাগ না হয়। ভোজনে অনুরাগযুক্ত হইয়া ভোজন করিও না।**" (চতুর্দশ অধ্যায়ঃ ভক্তি, পৃঃ ৭৪)।

এই স্ববিরোধিতা এত-ই স্পষ্ট যে, এ বিষয়ে বাকবিস্তার নিষ্প্রয়োজন। যখন তিনি শরীর রক্ষার দিকে তাকিয়ে, তাকে পুষ্ট ও কর্মঠ রাখার

দায়িত্ব স্বীকার করে আহারের বিধি দিয়েছেন, তখন তার সমস্ত বাস্তব প্রয়োজনগুলিও স্বীকার করেছেন। কিন্তু শরীররক্ষার নিজস্ব সার্থকতা অস্বীকার করে ভক্তির অনুবর্তিতা আনার সঙ্গে সঙ্গে, তিনি এমন বিধি দিতে বাধ্য হয়েছেন, যাতে শরীর অপুষ্ট এমনকি অসুস্থ হয়ে পড়ে। বিপদ হয়েছে উভয়কে একাকার করার চেষ্টায় এবং তার চেয়েও বেশী, অন্য বৃত্তিকে ভক্তির প্রয়োজনে নিযুক্ত করার চেষ্টায়। ফলে, এদিক ওদিক দুই দিকই নষ্ট হয়েছে।

ভক্তিতত্ত্বের আলোচনা সমাপ্ত করার পূর্বে আর একটি প্রসঙ্গের আলোচনা প্রয়োজন। দশম অধ্যায়ে (পৃঃ ৫২-৬০) তিনি 'মনুষ্যে ভক্তি' এই শিরোনামায় সমাজে ও রাজনীতিতে তাঁর ভক্তিতত্ত্বের প্রয়োগ দেখিয়েছেন। এ বিষয়ে পূর্বেই কিছুটা আলোচনা হয়েছে* তবু আলোচনার সম্পূর্ণতার প্রয়োজনে সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্যের সারভাগ বিচার করা দরকার। তাঁর দৃষ্টিতে, সমাজ নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্টে বিভক্ত। এবং নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্টের মধ্যে এই পার্থক্য কিন্তু কারুর-ই গুণের তারতম্য বশত ঘটেনি। সমাজ-কাঠামোয় বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থান-জনিত তারতম্যের কারণেই কেউ স্বতই উৎকৃষ্ট এবং উপকারী আবার কেউ নিকৃষ্ট। উৎকৃষ্ট যাঁরা, তাঁরা সংজ্ঞাবলে নিকৃষ্টদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এই এই সব উৎকৃষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হলেন (১) পিতামাতা, (২) স্বামী (স্ত্রী যদি স্বয়ং নৈতিক গুণে শ্রেষ্ঠ হন তাহলে তিনিও উৎকৃষ্ট পদবাচ্য, কিন্তু সামান্যত স্বামী) এবং সাধারণত বয়োজ্যেষ্ঠরা। (৩) গুরু এবং সমাজের শিক্ষকেরা ; যেমনঃ প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ, এবং উনিশ শতকে কেশব সেন প্রমুখ ধর্মনেতা। উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ এবং নিকৃষ্টদের মধ্যে ভেদনির্ণয়ে উভয়ের গুণগত তারতম্য বিচার না করে কেবল সামাজিক কাঠামোগত সম্পর্ককে (Social-formal relation) মূল রূপে উপস্থিত করা নৈতিক মূল্যমানের অবশ্যই পরিপন্থী। (তুলনীয় বঙ্কিমচন্দ্রের-ই 'ভালোবাসার অত্যাচার' প্রবন্ধে পারিবারিক আনুগত্যের সীমাবদ্ধতার বিষয়ে আলোচনা)। কিন্তু সমস্যা শুধু তাই নয়। বিষয়ের

* (পৃঃ ৫৬-৫৭ দ্রষ্টব্য) বঙ্কিমচন্দ্র। সমাজ ও রাজনীতি

আলোচনায় বিষয়ের গুণকে আলোচনার বাইরে রেখে, কেবলমাত্র কাঠামোর দ্বারা স্থিরীকৃত সম্পর্কের ওপর গুণ আরোপ করার ফলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে সম্পর্কগুলিকে Ideal বা আদর্শ, ভাবগত বলে ধরে নেওয়ার প্রয়োজন হয়। কোন ক্ষেত্রেই real বা বাস্তব হিসেবে ধরা যায় না। এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তিনি বিশেষত রাজানুগত্য বা রাজভক্তির আলোচনায। যথা ঃ

"গুরু। পিতা যেমন সন্তানের ভক্তির পাত্র, রাজাও সেইরূপ প্রজার ভক্তির পাত্র।…হিন্দুধর্ম্মে পুনঃ পুনঃ রাজভক্তির প্রশংসা আছে। যেখানে [রাজভক্তি] আছে—যথা জর্ম্মাণি বা ইতালি, সেখানে রাজ্য উন্নতিশীল।" (পৃঃ ৫৪)

এই আলোচনায় রাজা অবশ্যই বাস্তব বা real। জর্মানি বা ইতালীর উল্লেখে তা আরো স্পষ্ট, কারণ উক্ত দুটি দেশে তখন মোটামুটি Absolute Monarchy বা চূড়ান্ত-ক্ষমতা-সম্পন্ন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখানে রাজার রাজত্বের ভিত্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং সমস্ত রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন সেই রাজশক্তির অনুবর্তী। কিন্তু এর পর শিষ্য প্রশ্ন তোলেন যে, মন্দ রাজাকে ভক্তি করা কর্তব্য কিনা। গুরু বলে চলেন,…"যে মনুষ্য রাজা, সেই মনুষ্যকে ভক্তি করা এক বস্তু, রাজাকে ভক্তি করা স্বতন্ত্র বস্তু।…যে রাজ্য সাধারণতন্ত্র সেইখানকার কথা মনে করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, রাজশক্তি কোন মনুষ্য বিশেষের প্রতি ভক্তি নহে। আমেরিকার কংগ্রেসের বা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কোন সভ্যবিশেষ ভক্তির পাত্র না হইতে পারেন কিন্তু কংগ্রেস ও পার্লামেন্ট ভক্তির পাত্র সন্দেহ নাই।" (পৃঃ ৫৪-৫৫)

গুরুর উক্তিতে রাজনীতির একটা প্রাথমিক ভুল প্রথমেই চোখে পড়ে। আমেরিকার কংগ্রেস বহুলাংশে উপহাসের পাত্র এবং কেবল পার্লামেন্টের প্রতি স্বতন্ত্র ভক্তি বা আনুগত্য স্টুয়ার্টদের গৃহযুদ্ধের সময় ব্যতীত কেউ দাবী করেন নি। উভয় ক্ষেত্রেই দেশের শাসনতন্ত্রের প্রতি-ই আনুগত্য বিহিত; আমেরিকায় তা লিখিত, ব্রিটেনে তা

King-in-parliament-এর মধ্যে স্ফুরিত। কিন্তু এই ভুল মূল বক্তব্যকে প্রভাবিত করে না। এক্ষেত্রে মূল বক্তব্য এই যে, রাষ্ট্রে রাজা নয়, রাজা-স্বরূপ যে শক্তি রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী, চালক ও ধারক, সেই শক্তি-ই ভক্তির পাত্র। এখানে রাজা শব্দটির ব্যবহার হয়েছে তার ideal অর্থে, রাজকীয় শক্তি এই অর্থে। সেটি একটি ভাব, এবং ধারণাগম্য সত্তা। তার আইনগত কাঠামো ও রূপ স্বতন্ত্র।

এর পর শিষ্য প্রশ্ন করেন: "তবে কি একটা দ্বিতীয় ফিলিপ বা ঔরঙ্গজেবের ন্যায় নরাধমের বিপক্ষে বিদ্রোহ পাপ বলিয়া গণ্য হইবে?

গুরু। কদাপি না। রাজা যতক্ষণ প্রজাপালক ততক্ষণ তিনি রাজা। যখন তিনি প্রজাপীড়ক হইলেন, তখন তিনি আর রাজা নহেন……।" (পৃঃ ৫৫)

এই খানেই ধারণাগত বিপর্যয় (Confusion of Categories) চূড়ান্ত অবস্থায় উপনীত হয়েছে—কারণ এখানে তিনি একই সঙ্গে Real ও Ideal রাজা সম্বন্ধে দুই ধারণা একাকার করে ফেলেছেন। যে রাজার প্রজা পালনের ক্ষমতা আছে তিনি স্বয়ং রাজশক্তির ধারক। অর্থাৎ তিনি Real। তাঁর অস্তিত্ব তিনি প্রজাপীড়ন করলেও দূর হবার নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত আইন ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো বাস্তবে না বদলায়। প্রজাপীড়ন করলেও তিনি রাজাই থাকেন, 'রাজা নহেন' হন না। জার্মানীর সম্রাট (যার নজীর বঙ্কিম দিয়েছেন) সমাজতন্ত্রবাদী প্রজাদের ওপর এবং তার পূর্বে প্রুশিয়ার রাজারা গণতন্ত্রবাদীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েও রাজা হয়েই ছিলেন। প্রজাপীড়ন করার ফলে যেটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা রাজত্ব নয়, রাজকীয় শক্তিও নয়, শুধু রাজশক্তির নৈতিক মূল্য। সেটি একটি ভাব, সে না থাকলেও বাস্তব রাজা রাজাই থাকেন যদি তাঁর বাস্তব ক্ষমতা থাকে। এবং হিন্দুধর্মের বিধিমত তাঁকে ভক্তি করতে হলে বিচার চলে না। এই দুই স্বতন্ত্র category বা শ্রেণীর ধারণাকে একই সঙ্গে একাকার করে পরিবেশন করার ফলে তাঁর উপদেশ শেষ পর্যন্ত দ্ব্যর্থভাষণ বা equivocation হয়ে যায়, কোন কর্তব্যসূত্র স্থির করতে সাহায্য করে না। কারণ

প্রথমে, তাঁর ভাষ্যে রাজা ভক্তির পাত্র কারণ তিনি রাজা। তাঁর দ্বিতীয় ভাষ্যে, রাজা যদি ভক্তির পাত্র হন তবেই তিনি রাজা। এক্ষেত্রে রাজা কি, তাই সমস্যা হয়।

বস্তুত Real ও Ideal সম্পর্কিত এই গোলযোগ যদি সমাজ-নীতির ক্ষেত্রে আরোপ করা যায় তাহলে কি অবস্থার উদ্ভব হয়? যদি বলা হয়, পিতা ব্যক্তিটি বা স্বামী ব্যক্তিটি ভক্তির পাত্র নয়, সন্তানের পালক ও জনক রূপ পিতৃত্বের ধারণা, বা স্ত্রীর প্রেমিক ও ভর্তা রূপ স্বামীত্বের আদর্শ-ই ভক্তির পাত্র, এবং মানুষ পিতাকে নয়, পিতৃরূপে কারুকে ভক্তি করবে এবং স্বামীকে নয়, স্বামীত্বের আদর্শে গঠিত আদর্শ কারুকে ভক্তি করবে, তাহলে পরিবারের গঠন কোথায় থাকে? এবং ভক্তিতত্ত্ব-ই বা কোথায় দাঁড়ায়? পারিবারিক নীতির ক্ষেত্রে আমরা এই সমস্যা এড়িয়ে যাই কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের আবেগ Real ও Ideal-কে একাকার করে দেখায়। রাজার ক্ষেত্রে, পরাধীন দেশের বঙ্কিমের মধ্যে সেই আবেগ স্বভাবতই অনুপস্থিত, অথচ রক্ষণশীল আদর্শবিস্তারে রাজশক্তির প্রতি আনুগত্যও বিধেয়, ফলে উভয়ের এলো-মেলো মিশ্রণ ও স্ব-বিরোধ। তদুপরি হিন্দুধর্মের অপ্রাসঙ্গিক অবতারণা।

ভক্তির পর প্রীতি, দয়া ইত্যাদি বিবিধ উৎকৃষ্ট বৃত্তির ব্যাখ্যা আছে। সেগুলির প্রকৃতি পর্যালোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। শুধু তাঁর বিচারের একটি মূল ধারার আলোচনা আবশ্যক মনে হয়। হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে গিয়ে তিনি বহুক্ষেত্রে পাশ্চাত্য মতাদর্শের সঙ্গে তার তুলনা করেছেন। এবং প্রায় সর্বক্ষেত্রেই এই তুলনায় confusion of categories ঘটেছে। কারণ পাশ্চাত্যের ক্ষেত্রে তিনি দিয়েছেন তাদের বাস্তব অবস্থার নজীর এবং হিন্দুর ক্ষেত্রে দিয়েছেন হিন্দুধর্মের আদর্শের নজীর, হিন্দুশাস্ত্রের নজীর। পাশ্চাত্য প্রীতির আদর্শের আলোচনায় তাদের জাতীয় প্রীতির সীমাবদ্ধ রূপের আলোচনা পাই, অথচ হিন্দুর প্রীতির আদর্শের আলোচনায় আমরা, ছুঁৎমার্গের সীমাবদ্ধতার কথা পাই না, পাই হিন্দুশাস্ত্রে উল্লিখিত সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শনের তত্ত্ব। ঘটনার সঙ্গে তত্ত্বের তুলনা যে অচল কারণ দুটি স্বতন্ত্র কোঠা বা

category'র জিনিস, সে চেতনা ধর্ম্মতত্ত্বে নেই। তা ছাড়া সর্বভূতে সমদৃষ্টি, শাস্ত্র অনুসারে, জ্ঞানমার্গের শেষ ধাপ। সেটি কর্মবদ্ধ সাধারণ জীবের অবস্থা নয়। এইসব ধারণা যাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরা তার অবয়ব স্পষ্টত চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন (দ্রষ্টব্য একবিংশতম অধ্যায়ঃ প্রীতি, পৃঃ ১০৫ ও ১০৭)

হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি অনেক ক্ষেত্রে দার্শনিকের পর্যায় থেকে নেমে উকীলের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছেন। দার্শনিক আবিষ্কার করতে চান সত্য, তিনি অনুসন্ধান ও যুক্তির (reason) ওপর নির্ভর করেন। উকীল তাঁর পূর্ব নির্দিষ্ট ধারণার প্রমাণকল্পে তর্কের (argument) সৃষ্টি করেন। সত্য কি তা আগেই তিনি স্থির করে ফেলেছেন—তাকে সর্বসমক্ষে প্রমাণ করার জন্যে তিনি যত্রতত্র নজীর আহরণ করেন। বঙ্কিমও তাই করেছেন। তা না হলে এটা কি আশ্চর্য নয় যে, আধুনিক যুগের প্রাক্কাল পর্যন্ত হিন্দুর দেশরক্ষার অনাগ্রহ, দেশাত্মবোধের অভাব, বহিরাগত পাঠান ও মোগল রাজত্ব বা ইংরেজ রাজত্ব অপ্রতিবাদে মেনে নেওয়া, ইত্যাদিকে তিনি হিন্দুর নির্বিচার সর্বলোকবাৎসল্যের প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করাবেন? জাতিভেদপীড়িত সমাজের আত্মবিস্মৃতি, খণ্ড খণ্ড স্বার্থবুদ্ধি, বৃহৎ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সম্পর্কে অচেতনা, এসব-ই তাঁর বোধকে স্পর্শ করবে না! (পৃঃ ১০৮) হিন্দুর বাস্তব অবস্থার সত্য আবিষ্কারের দায়িত্ব তাঁর নেই, হিন্দুর উৎকর্ষ প্রমাণ করবার জন্যে ওকালতীতে আত্মনিযুক্ত তিনি।

অথচ পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাব মনে মনে পাশ্চাত্য আদর্শে দীক্ষিত হওয়ার দরুণ তিনি সর্বত্রই পাশ্চাত্য মতাদর্শের নিরিখে হিন্দুধর্মকে ঢেলে সাজার চেষ্টা করেছেন। এর ফলে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই হিন্দু ধারণাগুলির অন্তর্নিহিত আত্মিক সৌন্দর্য ও মহিমা, বিকৃত ও ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এই বিকৃতির সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ চোখে পড়ে দ্বাবিংশতম অধ্যায়ে, যেখানে তিনি নিষ্কাম আত্মপ্রীতি ব্যাখ্যা করেছেন। সেই ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি Herbert Spencer-এর সামাজিক দায়িত্ব ও চেতনাবিরোধী,

সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থপরতার দর্শনের সঙ্গে হিন্দুর বিশ্বজনীন ঈশ্বরপ্রীতির যোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। পুঁজিবাদের প্রসারের যুগে পুঁজিবাদীর বিরামহীন আত্মস্বার্থসাধনের নৈতিক ভিত্তি রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন Herbert Spencer। তাঁর মতে আত্মস্বার্থ-সাধন প্রাথমিক, কারণ মানুষ নিজে না বাঁচলে কোন ভালো কাজ করতে পারে না। সুতরাং, "The acts required for continued Self-preservation *including the enjoyment of benefits* achieved by such acts, are the first requisites to universal welfare." (উদ্ধৃতি, পৃঃ ১১০। ইটালিকস আমার) শ্রমজীবীর রক্তমোক্ষণ করে ও প্রতিযোগীর গলা কেটে যিনি বিত্তের পর্বত সঞ্চয়ে মগ্ন, তিনি সার্বজনীন কল্যাণ (universal welfare) বৃদ্ধি করে চলেছেন। এই কুযুক্তিজাল সহজেই ছিন্ন করা যায়। ব্যক্তির অস্তিত্ব যদি তার সমস্ত সৎকাজের প্রাথমিক পূর্বশর্ত হয়, তাহলে সমাজের অস্তিত্ব ব্যক্তির অস্তিত্বেরও প্রাথমিক পূর্বশর্ত। সুতরাং সমাজকল্যাণের প্রতিকূল ব্যক্তিস্বার্থের যদি কোন ক্ষেত্র থাকে, তবে তাকে অবশ্যই বিলুপ্ত করতে হবে। অথচ বঙ্কিম সে পথে না গিয়ে Spencer এর অনৈতিক মতাদর্শে ভারতীয় বিশ্বজনীনতার নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা করলেন: "যদি সর্ব্বভূতের হিতসাধন ধর্ম্ম হয় তবে পরের হিতসাধনও যেমন আমার ধর্ম্ম, তেমনি আমার নিজেরও হিতসাধন আমার ধর্ম্ম। কারণ আমিও সর্ব্বভূতের অন্তর্গত।... আত্মপ্রীতি ও জাগতিক প্রীতি এক।" দ্বাবিংশতম অধ্যায়ঃ আত্মপ্রীতি (পৃঃ ১১২)

অথচ ধর্মের সবলার্থের প্রতি দৃষ্টি দিলে তিনি বুঝতেন যে দেহী ও দেহ অব্যবহিত, সুতরাং দেহবুদ্ধি যতক্ষণ বর্তমান, ততক্ষণ জগতের সঙ্গে দেহীর সম্পর্ক ও স্বদেহের সঙ্গে তার সম্পর্ক এক হয় না। এবং দেহধর্মপালনে দেহী স্বতই নিযুক্ত বলে, ধর্মের নির্দেশে তার স্বতন্ত্র বিধানও অনুপস্থিত। আর সেই কারণে, যতক্ষণ দেহবুদ্ধি আছে ততক্ষণ জাগতিক প্রীতি ও আত্মপ্রীতি এক নয়, হতে পারে না। ধর্মের গূঢ়ার্থের সম্বন্ধে যদি তিনি সচেতন হতেন, তাহলে এও উপলব্ধি করতেন

যে, যে অবস্থায় সর্বভূতে আত্মবোধ উপলব্ধ হয়েছে, সেই অবস্থায় আত্ম-পর ভেদ লুপ্ত হয়েছে। সেক্ষেত্রে আত্মপ্রীতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অসম্ভব। সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন এই বোধ যার হয়েছে, হিন্দু ধারণায় তার আত্মপর ভেদবুদ্ধি নেই; সুতরাং সেক্ষেত্রে পরের প্রতি প্রীতি ও আত্মপ্রীতি ইত্যাদি স্বতন্ত্র ধারণার স্তর গুলিও অতিক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং হিন্দু ধারণার সঙ্গে Herbert Spencer-এর সমন্বয়-সাধন করতে গিয়ে হিন্দু আত্মিক ঐতিহ্যের ওপর উনিশ শতকের স্থূল হস্তাবলেপ ঘটেছে শুধু। বস্তুত মোক্ষ বা মুক্তির ধারণাতে যেমন, এখানেও তেমনি দেখি যে, অন্তরে অন্তরে তৎকালীন সংকীর্ণ ইংরেজি চিন্তাকে শেষ কথা বলে মেনে নেওয়ার ফলে, এবং সেই মাপে হিন্দু ঐতিহ্যকে মাপসই করার চেষ্টায়, হিন্দু ঐতিহ্যকে খর্ব ও অসুন্দর করা হয়েছে শুধু। মনে হয় এই আত্মিক ঐতিহ্যের মধ্যে যে *finesse* বর্তমান, এর মধ্যে মানুষের যে সীমাতিরিক্ত উদার আকাংক্ষা রয়েছে, যা মানুষকে আত্মসীমা অতিক্রম করে ভূমার মধ্যে আত্মবিসর্জনের আহ্বান জানায়, তার মহিমা, তার সৌন্দর্য, তার চরিত্রবৈশিষ্ট্য. তাঁর অন্তরকে শেষ পর্যন্ত স্পর্শ করেনি। তাঁর ধর্মব্যাখ্যা যে রামকৃষ্ণকে পীড়িত করেছিল, তা বোধ হয় অকারণে নয়।

ধর্মকে বিজ্ঞানের বা তথাকথিত বৈজ্ঞানিক দর্শনের ভিত্তিতে দাঁড় করাতে গিয়ে বঙ্কিম শেষ পর্যন্ত ধর্মভাবের যে ক্ষতি করেছেন. তা তাঁরই সমসাময়িক Matthew Arnold এর ভাষায় বলা যায়, "Our religion has materialised itself in the fact, in the supposed fact and now the fact is failing it". (*The study of Poetry : Essays in crticism p. 1.*)

বঙ্কিমকে হয়তো শেষ পর্যন্ত দার্শনিক বলে স্বীকার করা যাবে না। কারণ শুধু তাঁর চিন্তার পারস্পরিক অসঙ্গতি বা স্ব-বিরোধ নয়। কারণ শুধু তাঁর ধারণাগুলি স্বভাবিত না হয়ে সবই বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত বলেও নয়। কারণ এই যে, তিনি সত্যনির্ণয় করতে অগ্রসর হন নি। কারণ এই যে, তিনি পূর্বপ্রতিজ্ঞার প্রমাণকল্পে তর্কজাল বয়ন

করেছিলেন ; যে প্রক্রিয়া বিচারহীন বিশ্বাসের সূত্রে লব্ধ। কাজেই সে তর্কের মূলে কোন ব্যাপক ও একাগ্র যুক্তি নেই, যা রামমোহনের ছিল, ছিল অক্ষয় দত্তের। তার ভিত্তি দুর্বল সর্বদা ক্ষেত্র পরিবর্তন করে, যাতে স্ববিরোধের উদ্ভব না হয়ে পারে না। পশ্চিমী ভাবনা ও প্রাচীনবোধ ও কাঠামোর প্রতি আকর্ষণ, এই দোটানার আবর্ত তাঁর বিচারের পদ্ধতিকে প্রভাবিত করেছিল। দুই বিপরীতমুখী আকর্ষণের ফলে তাঁর বিচার নিম্নলিখিত ধারা অনুসরণ করে।

প্রথমে তিনি একটি বাদ (theses) উপস্থাপিত করেন। পরে তিনি তার প্রতিবাদ (counter theses) অন্তত reservations বা শর্তাবলী উপস্থিত করেন এবং মেনে নেন।

অতঃপর প্রতিবাদের স্বীকৃতির ফলে মূল বাদের যে সংশোধন বা পরিবর্তন প্রয়োজন, তা তিনি দেখেন না। বাদ ও প্রতিবাদের ঘাত প্রতিঘাতে যে সংবাদের (Synthesis) উদ্ভব হয় বা হতে পারে, সে দিকে অগ্রসর হন না তিনি। প্রতিবাদকে মৌখিক স্বীকৃতি দিয়ে পূর্বকথিত বাদের-ই পুনরুল্লেখ করেন। আবার সেই বাদকেই সম্পূর্ণ গ্রাহ্য সত্য বলে দাবী করেন। প্রবল বিশ্বাসের সঙ্গে দাবী করেন। বাদের মধ্যে প্রতিবাদ কেবলমাত্র বিশ্বাসের গুণে লীন হয়। বাদ ও প্রতিবাদের সম্পর্ক বিনাবিচারে অগ্রাহ্য হয়। ফলে কোন ক্ষেত্রেই কোন গ্রাহ্য সিদ্ধান্ত, কোন গ্রাহ্য সংবাদের উদ্ভব হয় না।

বঙ্কিমের এই অসম্পূর্ণ অযৌক্তিক বিচারপদ্ধতি যে তৎকালীন শিক্ষিত শ্রেণীর কাছে গ্রাহ্য হয়েছিল, তার কারণও অস্পষ্ট নয়। তাঁদের বোধ ও বিশ্বাস, সমাজ-কাঠামোর মধ্যে থেকে পাওয়া। তাঁদের চিন্তা বা বিশ্ব সম্পর্কে ধারণাগুলি পাওয়া পশ্চিমী শিক্ষা থেকে। বাদের মধ্যে তাঁদের প্রথাসূত্রে প্রাপ্ত বোধগুলি ধ্বনিত হয়। প্রতিবাদের মধ্যে নতুন ধারণাগুলি মৌখিক স্বীকৃতি পায়। বিবেকের তৃপ্তি সাধন করে। এবং সংবাদের কোন চেষ্টা না করে বাদের পুনরুক্তি ও পুনরুক্তি' প্রাবল্যে বাদেরই জয় ঘোষণায়, শেষ পর্যন্ত সংস্কার জয়ী হয়ে তাঁদের মানসিক আরাম নির্বিঘ্ন করে। আর রণাঙ্গণে বাদ ও প্রতিবাদে, পক্ষ-বিপক্ষ

যখন তাঁরা নিজেরাই, তখন স্বপক্ষের জয় সর্বদাই পূর্বনির্দিষ্ট থাকে। এই জন্যেই একদা ঋষি বলে বন্দিত চিন্তানায়ক বঙ্কিম, বর্তমানে চিন্তার ক্ষেত্র থেকে অপসৃত, ধূলিজালের অন্তরালে অবলুপ্ত।

অথচ তিনি যে ঋষি বলে বন্দিত হয়েছিলেন তাও নিশ্চয় অকারণে নয়। একদিকে পুনঃ পুনঃ 'হিন্দুধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ', 'হিন্দুধর্ম সর্বসুখকর' হিন্দু তথা পৌরাণিক ধর্ম 'সর্বাঙ্গসম্পন্ন' বলে, ইংরেজের উপহাস ও ধিক্কার পীড়িত এবং পদানত তৎকালীন শিক্ষিত হিন্দু ভদ্র শ্রেণীর গোষ্ঠিগত আত্মাভিমান তথা আত্মসম্মানকে জোরদার করলেন; অন্যদিকে পাশ্চাত্য মতামতকে যে ভাবেই হোক মেনে নিয়ে, নতুন শিক্ষার মর্যাদাও রক্ষা করলেন। এমন কি স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে হলেও হিন্দু রীতিনীতির প্রতিবাদ জানালেন। লৌকিক ধারণায় অলৌকিক স্বর্গের স্থূল চিত্র দর্শন করে সমস্ত তর্কজাল সরিয়ে, 'সর্বাঙ্গসম্পন্ন পৌরাণিক ধর্মের' মহিমা বিস্মৃত হয়ে চিৎকার করে উঠলেন, "হিন্দুধর্ম্ম মানি, হিন্দুধর্ম্মের "বখামি" গুলা মানি না।" (পৃঃ ৩৭) অথবা চতুপার্শ্বে অনুষ্ঠানিক হিন্দুয়ানির আড়ম্বর দেখে ধিক্কার দিয়ে উঠলেন, "যে কেবল লোকের দ্বেষ করে, লোকের অনিষ্ট করে, পরের সঙ্গে বিবাদ করে, লোকের কেবল জাতি মারিতেই ব্যস্ত, তাহার গলায় গোচ্ছা করা পৈতা, কপালে কপালজোড়া ফোঁটা, মাথায় টিকি এবং গায়ে নামাবলি ও মুখে হরিনাম থাকিলেও তাহাকে হিন্দু বলিব না। সে ম্লেচ্ছের অধিক ম্লেচ্ছ, তাহার সংস্পর্শে থাকিলেও হিন্দুয়ানি যায়।" (বিংশতিতম অধ্যায়ঃ ভক্তি, পৃঃ ৯৭) সর্বোপরি, স্পষ্টত ঘোষণা করলেনঃ "আত্মপ্রীতি স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশুপ্রীতি, দয়া, এই প্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্বদেশ-প্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলা উচিত।" (পৃঃ ১৪১)

বস্তুত বঙ্কিমের স্ববিরোধ, তৎকালীন হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণীর অন্তর্নিহিত স্ববিরোধের-ই প্রতিফলন শুধু। এই মধ্যশ্রেণী একদিকে ইংরেজি শিক্ষা পেয়েছেন, নতুন ভাবনার সংস্পর্শে এসে, জীবনকে গ্রহণ করার, ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণত বিকাশ করার ডাক শুনেছেন। অন্যদিকে তাঁদের সমাজ-জীবনের কাঠামো ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার

কল্যাণে অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। তাঁদের বোধ, বিশ্বাস, পারিবারিক জীবনের কাঠামো ও মূল্যবোধ, মধ্যযুগের থেকে তিলেক বিচ্যুত হয়েছে কি না সন্দেহ। সর্বোপরি, পরশাসনের পীড়নে, পরজাতীয়ের শ্লেষে বিদ্রূপে, ধিক্কারে, জাতীয়তার ক্ষেত্রে আত্মাভিমান হয়েছে প্রবল। এবং স্বয়ং উচ্চবর্ণের পুরুষ বলে, সমাজব্যবস্থার অসহ্য চাপ তাঁদের গায়ে লাগে নি। কাজেই প্রথাগত বিশ্বাসগুলিকে বজায় রেখে, নিজেদের privilege বা বিশেষাধিকার অক্ষুণ্ণ রেখে, ও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বাভিমানকে পুষ্ট করে, সেই সবের সঙ্গে জাতীয় প্রতিবাদ, নতুন শিক্ষা ও জ্ঞানের একটা সামঞ্জস্য খুঁজেছেন তাঁরা। আরো এই কারণে যে, এই নতুন শিক্ষাই ছিল তাঁদের আর্থিক জীবনের ও মর্যাদার ভিত্তি। তাঁরা যা শুনতে চেয়েছেন, উনিশ শতকের ভাষায় বঙ্কিম তাই তাঁদের শুনিয়েছেন, বিশদভাবে, বিস্তারিতভাবে, এদেশে তৎকালীন জ্ঞানের সমস্ত পরিধি বেষ্টন করে। কাজেই সমসাময়িক দেশবাসীর কৃতজ্ঞ করতালিধ্বনির মধ্যে বঙ্কিম হয়েছিলেন ঋষি।

বঙ্কিমের এই তৎকালীন গুরুত্ব চিন্তা করলে স্বভাবতই শীলরের মহদুক্তি স্মরণে আসে: 'The artist is surely the son of the age but pity for him if he be its favourite or even its pupil.' সম্ভবত জার্মানীর তৎকালীন দার্শনিক সমাজের কথা মনে রেখে (শীলর স্বয়ং কাণ্টের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত ছিলেন) তিনি আর্টিস্টের এর পক্ষে গুরু হবার দুর্ভাগ্যের কথা উল্লেখ করেন নি। হয়তো সে দেশে তা হতে পারত না। কিন্তু এদেশের অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে, শিল্পীর পক্ষে সেই পরিণামই সবাধিক ভয়াবহ। হয়তো বর্তমান লেখকের এই প্রচেষ্টাও সেই একই পরিণামের সংবাদ বহন করে।

পরিশিষ্ট

বঙ্কিমচন্দ্র ও মধ্যবিত্ত সমাজ

মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর সঙ্গে বঙ্কিমের একাত্মতার স্পষ্ট ও দ্বিধাহীন পরিচয় পাওয়া যায়, 'লর্ড রিপনের উৎসবের জমা-খরচ' শীর্ষক ছোট প্রবন্ধে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের শেষে প্রচার পত্রিকায় এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিধি প্রচলন করে, এবং এদেশীয় ইংরেজদের আক্রমণশীল জাতিবৈরিতাকে নানাভাবে নিরস্ত করে লর্ড রিপন বাংলার শিক্ষিত ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন শ্রেণীর প্রীতিভাজন হয়েছিলেন। ভারতে তাঁর কর্মকাল অবসিত হলে তাই শিক্ষিত শ্রেণী স্বতোপ্রবৃত্ত হয়ে বেসরকারী ভাবে তাঁকে অভিনন্দন জানান। বঙ্কিম উক্ত প্রবন্ধে এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে মন্তব্য করেন, "...আমাদের চতুর্থ লাভ—এটুকু কেবল বাংলার লাভ—সমাজের কর্তৃত্ব ভূম্যধিকারীদের হাত হইতে এই প্রথম মধ্যবিত্ত লোকের হাতে গেল। অর্থাৎ কর্তৃত্ব, ধনের হাত হইতে বুদ্ধি বিদ্যার হাতে গেল। এখন হইতে বাঙ্গালার ধনবানেরা আর কেহই নহেন, শিক্ষিত সম্প্রদায়-ই কর্তা। ইহা সমাজের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলকর, উন্নতির লক্ষণ, উন্নতির সোপান।" এই সঙ্গে তাঁর নিবেদন এই..."এখনকার নূতন সমাজ নেতৃগণের নিকট আমাদের নিবেদন, তাঁহারা সমাজ ধীরে ধীরে সুপথে চালাইলে, বিপ্লব না ঘটে।"

নির্ঘণ্ট ॥

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা সংখ্যা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১	১	সে	যে
১২	২৪	তা প্রাচুর্যবশতই	অপ্রাচুর্যবশতই
১৯	১	বস্তু	বস্তু
২৪	পাদটীকা ২	৩৬৫	১৭৬৫
২৫	পাদটীকা ৪	Partiamentary	Parliamentary
২৯	৭	টোনহলে	টৌনহলে
৩৫	২২	নবগের	নবযুগের
৩৬	৯	করার তাঁকার	করার
৩৭	৭	এপ্রিলে	ডিসেম্বরে
৩৯	১০	খ্রীস্টীয়ান	খ্রীষ্টীয়ান
৪১	৩	Chirst	Christ
৪২	৪	for	far
৫৬	৩	বিষয়ের	বিষয়ে
৫৮	১৪	নির্ণিত	নির্ণীত
৭০	পাদটীকা ১৫	১৮৮৫	১৮৫৫
৭১	২০	অধীন নহে	অধীন
৭১	২৫	ধর্ম্মশাস্ত্রমুমোদিত	ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত
১০৪	১২	দ্বারিকামোহন	দ্বারকানাথ
১১৫	৭	বংকিম	বঙ্কিম
১২০	১৭	Acquinas	Aquinas
১৩৮	৭	মুক্তি	মুক্তি
১৪৬	১৬	সর্বলোকবাৎসলের	সর্বলোকবাৎসল্যে
ঐ	২২	প্রভাব	প্রভাবে

বাংলার নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা

অসিতকুমার ভট্টাচার্য